ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি

শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট্য ও কর্মপদ্ধতি

শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭১৬৬৭১৪২৪
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN : 984-300-003061-2

প্রথম প্রকাশ : রবিউস্ সানি ১৪৩০
বৈশাখ ১৪১৬
এপ্রিল ২০০৯

প্রচ্ছদ : গোলাম মওলা

মুদ্রণ : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় : চল্লিশ টাকা মাত্র

'Islami Banking : Boisistya o karmapoddhoti' Written by Shah Muhammad Habibur Rahman Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition April 2009 Price Taka 40.00 only.

সূচীপত্র

উৎসর্গ

হালাল রুজী অন্বেষণের
মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন
অন্বিষ্ট যাদের–
তাদের উদ্দেশ্যে

লেখকের কথা

ইসলামী ব্যাংক নিয়ে মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। নতুন ধারার এই ব্যাংকিং পদ্ধতির বয়স অবশ্য বেশি দিন নয়। বলা যায় এখনও তার কৈশোর কাটেনি। তবে ইতোমধ্যেই তার সাফল্যের ছটা ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। সাফল্যের ঝুলিটিও ভারী হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশেই গত শতকের এবং চলতি শতকের গোড়ার দিকে বার কয়েক শীর্ষ ব্যাংকের আসন দখল করেছে বিদেশী মূল্যায়ন প্রতিষ্ঠানের বিচারেই। তাছাড়া মার্কিন মুলুকের মন্দার যে ঢেউ আছড়ে পড়ছে পৃথিবীর দিকে দিকে সেই ঢেউয়ের মুকাবিলায় মাথা উঁচু করেই দাঁড়িয়ে আছে ইসলামী ব্যাংকগুলো। তাই তার সম্বন্ধে আম জনতার কৌতূহল তো থাকবেই।

সেই কৌতূহল মেটানোর জন্য এদেশেই ইতোমধ্যে ডজনখানেক বই বেরিয়েছে বাংলায়। তার কোনটি কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি আর শরীয়াহর চুলচেরা বিশ্লেষণ দিয়ে ঠাসা, আবার কোনটি প্রফেশনাল ব্যাংকারের জন্য বিশেষ উপযোগী। সেসব বই পড়ে নতুন এই ধারার ব্যাংকে কাজের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়া অনেকটাই সহজ। তবে যারা ব্যাংকে চাকুরী চান না, ছাত্র হিসেবে এর পরীক্ষাও দেবেন না তাদের জন্য হালকা ওজনের সহজবোধ্য বই নেই বাজারে। ব্যাংকের লেনদেনের নানা টেকনিক্যাল খুঁটিনাটির গভীরে ডুব দেবার ইচ্ছে যাদের নেই অথচ নতুন ধারার এই ব্যাংক কীভাবে কাজ করে, কী তার বৈশিষ্ট্য, কেমন করে ব্যবসা-বাণিজ্য চালায় এবং সেই সঙ্গে মুনাফাও করে নতুন আঙ্গিকে তাদের জন্য সহজ করে লেখা বইয়ের বেশ অভাব বাজারে। সেই অভাব পূরণের জন্য এই প্রয়াস। বলতে দ্বিধা নেই, এ কাজে অকৃপণ সাহায্য নেওয়া হয়েছে বাজারে প্রচলিত বইগুলো হতে। এই সুযোগে সশ্রদ্ধ চিত্তে তাদের ঋণ স্বীকার করছি ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

যিনি এই উদ্যোগের নেপথ্যে তিনি বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের মাননীয় কর্ণধার অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ। মূলতঃ তাঁর উদ্যোগেই বইটি দিনের আলোর মুখ দেখছে। জানিনা কতটা সফল হওয়া গেছে। তবে যাদের জন্য এই প্রচেষ্টা তাদের কাজে আসলে শ্রম সার্থক বিবেচনা করবো।

১০ মার্চ, ২০০৯ ঈসায়ী
১২ রবিউল আউয়াল
১৪৩০ হিজরী

শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আল-কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় সর্বকালের জন্য, সকল বনি আদমের জন্য একদিকে যেমন ব্যবসাকে বৈধ ঘোষণা করেছেন অন্যদিকে সুদ ও সুদভিত্তিক সকল কার্যক্রমকে চিরতরে নিষিদ্ধ করেছেন। অথচ আজকের দুনিয়ায় সুদের সর্বগ্রাসী সয়লাব চলছে। সব ধরনের অর্থনৈতিক লেনদেন, ব্যবসায়িক কায়-কারবার সর্বত্রই সুদের অপ্রতিহত ও অবারিত গতি। সুদ সমাজ শোষণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, যুলমের সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। সুদের মাধ্যমে সমাজকে সবচেয়ে সুকৌশলে ও বেশি শোষণ করছে আজকের সনাতনী ব্যাংক ব্যবস্থা। কি পুঁজিবাদী দেশ, কি সমাজতন্ত্রী দেশ, কি মুসলিম প্রধান দেশ সর্বত্রই সনাতনী ব্যাংকগুলো সুদী কারবারে লিপ্ত। যারা ব্যাংক হতে নানা প্রয়োজনে ঋণ নেয় তারা তো সুদ দিতে বাধ্য হয়ই, এমন কি যারা শুধু নিরাপত্তা ও সঞ্চয়ের জন্যই ব্যাংকে টাকা আমানাত রাখে তাদেরও মুনাফার লেবাস পরিয়ে ব্যাংক সুদ নিতে প্ররোচিত করে। সমাজ বিধ্বংসী যুলমকারী এবং শোষণের সফল মাধ্যম এই সুদের হাত থেকে মুসলিম মিল্লাতকে রক্ষা করার জন্যই বর্তমানকালে সৃষ্টি হয়েছে ইসলামী ব্যাংকের।

সংজ্ঞা

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) জেনারেল সেক্রেটারিয়েট ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে– "Islamic bank is a financial institution whose statues, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations".

অর্থাৎ, ইসলামী ব্যাংক এমন একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা তার বিধি, আইন-কানুন এবং কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে ইসলামী শারীয়াহর নীতিমালার প্রতি সুস্পষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তার কোন কার্যক্রমেই সুদের কোনও রকম লেনদেন করে না।

ইসলামী ব্যাংকগুলোর আন্তর্জাতিক সংস্থা International Association of Islamic Banksও ইসলামী ব্যাংকের একটি সংজ্ঞা প্রদান করেছে। এ সংজ্ঞায় বলা হয়েছে–

"The Islamic bank basically implements a new banking concept, in that it adheres strictly to the ruling of the Islamic Shariah in the fields of finance and other dealings. Moreover, the bank which is functioning in this way must reflect Islamic principles in real life. The bank should work towards the establishment of an Islamic society; hence, one of its primary goals is the deepening of the religious spirit among the people."

অর্থাৎ, ইসলামী ব্যাংক মৌলিকভাবেই একটি নতুন ব্যাংকিং ধারণাকে বাস্তবায়ন করছে। এই উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান ফাইন্যান্স ও অন্যান্য কার্যক্রমে ইসলামী শারীয়াহর নির্দেশনা কঠোরভাবে মেনে চলছে। উপরন্তু এভাবে যে ব্যাংক কাজ করছে তাকে আবশ্যিকভাবেই বাস্তব জীবনে ইসলামের মূলনীতিসমূহকে প্রতিফলিত করতে হবে। একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাংককে কাজ করে যেতে হবে। তাই এর অন্যতম প্রাথমিক লক্ষ্যই হলো জনগণের মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণা গভীরতর করা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই সংজ্ঞা দুটির মধ্যে প্রথমটিই আন্তর্জাতিকভাবে অধিকতর স্বীকৃতি ও গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। এই সংজ্ঞাটি ১৯৭৮ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত ইসলামী দেশসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। ওআইসি জেনারেল সেক্রেটারিয়েট এটি প্রকাশ করে।

সুদী ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য

যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান সেহেতু ইসলামে অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, পারস্পরিক লেন-দেন প্রভৃতি সবকিছুরই সুস্পষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। অথচ সুদ প্রথা চালু থাকায় ইসলামী বিধি-বিধান মেনে এসব কাজে অংশগ্রহণ করা মুসলিমদের পক্ষে অসম্ভব। ইসলামী ব্যাংক এই সমস্যা সমাধানের জন্যই এগিয়ে এসেছে। এর কাজের পদ্ধতি অন্যান্য সব ধরনের ব্যাংক হতে ভিন্ন। কোন্ কোন দিক হতে ইসলামী ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংক হতে পৃথক অপর পৃষ্ঠায় তা দেখাবার চেষ্টা করা হলো।

সুদী ব্যাংক

১. কার্যক্রম ও পরিচালনা প্রণালী-কোন ধর্মীয় ভিত্তি নেই।

২. বিনিয়োগকারী পূর্ব নির্ধারিত হারে সুদ পাওয়ার নিশ্চয়তা পেয়ে থাকেন।

৩. কোন বাছ-বিচার ও বাধা-নিষেধ ছাড়াই মুনাফা সর্বোচ্চকরণ চূড়ান্ত লক্ষ্য।

৪. যাকাতের কোন সংশ্রব নেই।

৫. অর্থ ধার দেওয়া এবং সুদসহ তা ফেরত পাওয়াই প্রধান কাজ।

৬. ইসলামী ব্যাংকের তুলনায় এর কাজের পরিধি সংকীর্ণ।

৭. ঋণ খেলাপীদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ বা চক্রবৃদ্ধি সুদ দাবী করতে পারে।

৮. ব্যক্তিস্বার্থই প্রায়শঃ মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। ভারসাম্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধির নিশ্চয়তার জন্য এখানে উদ্যোগ বা কৌশল নেই।

৯. মুদ্রাবাজার হতে ঋণগ্রহণ তুলনামূলকভাবে সহজ।

১০. প্রদেয় ঋণ হতে প্রকাশ্য আয় পূর্বনির্ধারিত হওয়ার ফলে প্রজেক্ট মূল্যায়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব প্রদান গৌণ প্রসঙ্গ।

১১. মক্কেলের ঋণ গ্রহণযোগ্যতার উপরই অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

১২. মক্কেলের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে ব্যাংকের স্ট্যাটাস হলো-উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের।

১৩. সকল ধরনের আমানতের নিশ্চয়তা দিতে হয়।

১৪. ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের পার্থক্য করা হয় না।

১৫. এই ব্যবস্থায় যুলম ও শোষণের বিস্তার ঘটে।

ইসলামী ব্যাংক

১. কার্যক্রম ও পরিচালনা প্রণালী ইসলামী শারীয়াহর উপর প্রতিষ্ঠিত।

২. মূলধন সরবরাহকারী (বিনিয়োগকারী) এবং তহবিল ব্যবহারকারীর (উদ্যোক্তা) মধ্যে ঝুঁকি বণ্টনকেই উৎসাহিত করা হয়ে থাকে।

৩. মুনাফা সর্বোচ্চকরণ লক্ষ্য, তবে তা শারীয়াহর সীমারেখার মধ্যে।

৪. যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টন এর অন্যতম সেবামূলক কাজে পরিণত হয়েছে।

৫. লাভ-লোকসানের অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কাজ।
৬. সুদী ব্যাংকের তুলনায় কাজের পরিধি অনেক বেশি বিস্তৃত। কার্যতঃ এটি একটি বহুমুখী প্রতিষ্ঠান।
৭. ঋণ খেলাপীদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ দাবী করার কোন সুযোগ নেই।
৮. জনস্বার্থের উপর যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো ভারসাম্যপূর্ণ প্রবৃদ্ধির নিশ্চয়তা।
৯. মুদ্রাবাজার হতে ঋণ গ্রহণ তুলনামূলকভাবে কঠিন।
১০. লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বের নীতি ও কৌশল থাকায় প্রজেক্ট মূল্যায়ন ও দক্ষতা অর্জনের উপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।
১১. প্রজেক্টের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও টেকসই উন্নয়নের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে।
১২. মক্কেলের সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে ব্যাংকের স্ট্যাটাস হলো অংশীদারী বিনিয়োগকারী ও উদ্যোক্তা।
১৩. যথার্থভাবে বলতে গেলে ইসলামী ব্যাংক এটা করতেই পারে না।
১৪. সকল বিনিয়োগে হালাল-হারামের বিচার করা হয়।
১৫. এই ব্যবস্থায় আর্থ-সামাজিক সুবিচার ও কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

বৈশিষ্ট্য

ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে পাঁচটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। যথা– (১) সুদ বর্জন, (২) শারীয়াহসম্মত উপায়ে শিল্পোদ্যোগ ও ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ, (৩) শারীয়াহ সুপারভাইজারী বোর্ড, (৪) যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন এবং (৫) সমাজ উন্নয়নে অংশ গ্রহণ। এই বৈশিষ্ট্যসমূহের কারণেই একে অন্যান্য ব্যাংক হতে পৃথক করা সম্ভব।

১. সুদ বর্জন : ইসলামী ব্যাংকের প্রথম ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে কোন প্রকার লেন-দেন ব্যবসা-বাণিজ্য করবে না। যে সুদ হারাম, ঘৃণ্য ও সমাজবিনাশী সেই সুদের অনুপ্রবেশ যেন ইসলামী সমাজে ঘটতে না পারে

সেজন্য এই ব্যাংক নিজেই শুধু সুদী কারবার হতে বিরত থাকবে না, অন্যকেও বিরত থাকতে সহায়তা করবে। এর দর্শনই হলো– সুদ নেবে না, দেবে না, খাবে না এবং খাওয়াবে না। সুতরাং, সুদের হিসাব রাখা বা সাক্ষী রাখারও প্রয়োজন হবে না। সহীহ হাদীস অনুসারে সুদের হিসাব রাখা বা সাক্ষী থাকাও কবীরা গুনাহ। তাই সুদের পাপ হতে মুসলিমদের মুক্ত রাখার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করবে এই ব্যাংক। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কল-কারখানা স্থাপন, বৈদেশিক লেন-দেন সবক্ষেত্রেই এই ব্যাংকের নীতি ও কৌশল হচ্ছে সুদ বর্জন করা এবং ধীরে ধীরে সমাজ হতে এর উচ্ছেদ করা।

২. শারীয়াহসম্মত শিল্পোদ্যোগ ও ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ : ইসলামী ব্যাংকের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শারীয়াহসম্মত শিল্পোদ্যোগ ও ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ। শিল্পোদ্যোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে পুঁজি বিনিয়োগের সময় ঐসব উদ্যোগ শারীয়াহর বিচারে হালাল না হারাম তাও ইসলামী ব্যাংক বিচার করে থাকে। প্রচলিত পদ্ধতিতে কোন ঋণ দেওয়ার সময় আদৌ বিচার করা হয় না যে, যে উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া হচ্ছে সেই কাজটি সমাজের জন্য কল্যাণকর না ক্ষতিকর। সমাজের তাতে মঙ্গল হবে, না সর্বনাশ ডেকে আনবে। সমাজের বিপর্যয় ও সর্বনাশ সৃষ্টিকারী মদ ও মাদক দ্রব্যের ব্যবসা, চরিত্রবিধ্বংসী নানা ধরনের উপকরণসহ সিনেমা, নাচ-গান, তামাক ও সিগারেটের মতো জনস্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন, মজুতদারী, মুনাফাখোরী প্রভৃতি নানা কাজে সুদী ব্যাংকগুলো ঋণ দিয়ে থাকে। এতে সমাজের সর্বনাশ আরও বেশি করে ডেকে আনা হয়। আগুনে পেট্রোল ঢাললে যেমন আগুন আরও দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে এও ঠিক তেমনি। সমাজ হতে অনাচার, পাপাচার, অশ্লীলতা প্রভৃতি দূর করার চেষ্টা করা দূরে থাক সুদী ব্যাংকগুলো নির্বিচারে ঋণ দেওয়ার ফলে এসব বরং আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক এর প্রতিরোধ করতে চায়। এ জন্যই শুধু শারীয়াহসম্মত শিল্প কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতিতে এই ব্যাংক সহযোগিতা করে। ব্যাংক দু'ভাবে এটি করে থাকে ঃ (ক) লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের চুক্তিতে অংশগ্রহণ, এবং (খ) প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ।

(ক) লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের চুক্তিতে অংশগ্রহণ : ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, কল-কারখানা প্রভৃতি তৈরিতে তার মূলধন বা তহবিল দিয়ে অংশগ্রহণ করে থাকে। ব্যাংক এক্ষেত্রে উদ্যোক্তার সাথে লাভ-লোকসানে

অংশগ্রহণের চুক্তিতে পুঁজির অংশবিশেষ বা পুরোটাই সরবরাহ করতে পারে। এসব কাজে লাভ-লোকসান যাই হোক না কেন পূর্ব নির্ধারিত শর্ত অনুসারেই ব্যাংক তা ভাগাভাগি করে নেবে। অর্থাৎ, লাভ হলে ব্যাংক যেমন তার পূর্ব নির্ধারিত অংশ পাবে, তেমনি লোকসান হলে তারও অংশ ব্যাংক বহন করবে।

(খ) প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ : ইসলামী ব্যাংক তার নিজস্ব তহবিল এবং আমানাতকারীদের সম্মতিক্রমে তাদের তহবিল হতে সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে নিজস্ব মালিকানাতেই শারীয়াহ অনুমোদিত ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানা প্রভৃতি গড়ে তুলবে। এ ক্ষেত্রে লাভ-লোকসান যাই হোক না কেন তার দায়-দায়িত্ব ব্যাংকেরই, আমানাতকারীদের নয়। সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো এরকম কোন উদ্যোগ নেয় না।

সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার কোথাও এমন পদ্ধতি নেই। প্রচলিত ব্যাংকগুলো ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তাদের ঋণ দেয় ঠিকই, কিন্তু নিজে এসব প্রকল্প বা ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়ে না। তাই ঐসব কারবারের লাভ-লোকসান বা সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে ব্যাংকের কোন মাথা ব্যথা নেই। বরং লোকসানের কোন রকম সম্ভাবনা দেখলেই সুদনির্ভর ব্যাংকগুলো তাদের দেওয়া ঋণ দ্রুত পরিশোধের জন্য চাপ দেয় কিংবা ঋণ প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে ঐ ব্যবসা বা কারবারটি আরও সংকটের সম্মুখীন হয়, এমনকি ধ্বংসও হয়ে যায়।

৩. শারীয়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড : ইসলামী ব্যাংকসমূহের একটি প্রধান ও ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর শারীয়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড। ব্যাংকের লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মূলধন বা তহবিল বিনিয়োগ, নিজস্ব প্রকল্প স্থাপন ইত্যাদি কোন কিছুতেই যেন সুদের স্পর্শমাত্র না থাকে, কোন কাজেই যেন শারীয়াহর বরখেলাপ না হয় তা দেখার জন্য প্রতিটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার শুরুতেই গঠন করে শারীয়াহ বোর্ড। কোন কোন ইসলামী ব্যাংকে এর নাম শারীয়াহ সুপারভাইজরী কাউন্সিল। এই বোর্ডের সদস্য সংখ্যা সাধারণতঃ পাঁচ বা সাতজন হয়ে থাকে। এদের মধ্যে সংখ্যাগুরু থাকেন সুবিজ্ঞ আলেম ও ফকিহগণ। বাকীদের মধ্যে থাকেন একজন প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও অন্যজন অভিজ্ঞ ইসলামী আইনবিদ, ক্ষেত্রবিশেষে একজন প্রবীণ ব্যাংকার। এরা শুধু যে ব্যাংককে শারীয়াহসম্মতভাবে চলতে পরামর্শ দেন তা নয়, ব্যাংক ভুল

পথে চলতে চাইলে ব্যাংকের আর্টিকেলস অব এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী তাতে বাধা দেবার ক্ষমতাও এই বোর্ডের রয়েছে।

৪. যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন : ইসলামী ব্যাংকের চতুর্থ ও অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন। যাকাত ইসলামের পাঁচটি রুকনের অন্যতম এবং গুরুত্বের দিক দিয়ে নামাযের পরেই এর স্থান। ইসলামী ব্যাংক তার উদ্বৃত্ত তহবিল ও অব্যবহৃত অর্থের উপর যাকাত দিয়ে থাকে। ব্যাংক তার গ্রাহকদের নিকট থেকেও যাকাত সংগ্রহ করে থাকে। যাকাত তহবিলের এই টাকা শারীয়াহসম্মত খাতেই ব্যয় করা হয়। আজকের সমাজে মুসলিমরা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ও উদ্দেশ্যহীনভাবে যাকাত প্রদান করে থাকে। এতে সমাজের কোন স্থায়ী কল্যাণ সাধন হয় না। দরিদ্র ও সমাজের কম ভাগ্যবানদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় না। তাই ইসলামী ব্যাংক চেষ্টা করে যাকাত তহবিলের অর্থ দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মসংস্থানমুখী উপকরণ সরবরাহ ও শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা করতে। এভাবে যাকাতের অর্থ ব্যবহার করে একই সঙ্গে কর্মসংস্থান ও নিয়মিত আয়ের একটা নিশ্চয়তা গড়ে তুলতে ইসলামী ব্যাংকগুলো বদ্ধপরিকর। সমাজের ধনী-দরিদ্রের শ্রেণী বৈষম্য হ্রাস করার জন্য এটি একটি কার্যকর ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

৫. সমাজ উন্নয়নে অংশগ্রহণ : ইসলামী ব্যাংকের সর্বশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো, অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সামাজিক উন্নতি অর্জন করা। দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় ও সম্পর্ক না থাকলে কারোরই প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। তাই ইসলামী ব্যাংক কি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসায়ে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, কি নিজস্ব প্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে সব সময়ই এই লক্ষ্য সামনে রাখে যে, এসব কাজ সমাজের উন্নতিতে কতটা সহায়ক হবে? ব্যক্তির অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে জনসাধারণের উন্নতি কতটা হবে?

সমাজের প্রয়োজন ব্যাপক ও বহুমুখী। অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এজন্যই সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো সিনেমা হল নির্মাণ বা সিনেমা শিল্পে অর্থ ঋণ দেয়। ইসলামী ব্যাংক তা আদৌ চাইবে না। কারণ সিনেমার প্রসারের ফলে সমাজের নৈতিক অবক্ষয় আরও দ্রুত ও ব্যাপক হবে। সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর আদৌ এ বিষয়ে মাথা ব্যথা নেই। আবার ইসলামী ব্যাংকগুলো সৎ

ও যোগ্যতাসম্পন্ন বিত্তহীন লোককে করযে হাসানা বা মুদারাবার ভিত্তিতে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করবে, কিন্তু সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো এই উদ্যোগ নেবে না। ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য হলো ব্যক্তির কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তার ও তার পরিবারের ভরণ-পোষণের সুযোগ সৃষ্টি করা। ফলে সমাজে সুস্থ ও কল্যাণধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি হবে। পক্ষান্তরে সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো শুধু স্ব স্ব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তৎপর। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে সুদভিত্তিক ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে দুস্তর ও দুরতিক্রম্য ব্যবধান রয়েছে। বিশেষ করে সমাজকল্যাণ ও সমাজের সুস্থ ও সুষ্ঠু উন্নয়নের জন্য সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর কোন পরিকল্পনা নেই। এদিক দিয়ে ইসলামী ব্যাংকগুলো একটি স্বস্তিকর ও মহৎ ব্যতিক্রম। এটি এই ব্যাংকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও বটে।

এসব বৈশিষ্ট্য অর্জনের সাথে সাথে নিচের উদ্দেশ্যগুলো অর্জনেও ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংকগুলোকে তৎপর থাকতে হবে। তাহলে একাধারে ইসলামী বৈশিষ্ট্য অর্জন ও দেশের অর্থনীতিতে কাঙ্ক্ষিত অবদান রাখার পাশাপাশি বর্তমান সময়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যারা অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ, তাদের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক সত্যিকার কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ও গুরুত্ব অর্জনে সক্ষম হবে। এসবের মধ্যে রয়েছে :

১. ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা;
২. বিত্তহীন ও স্বল্প আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন;
৩. মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
৪. ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ; এবং
৫. মানব কল্যাণের জন্য পরিবেশের উন্নয়ন।

সুদী ব্যাংকের সাথে ইসলামী ব্যাংকের যে বিপুল পার্থক্য তার প্রায় সবটাই কাজের প্রকৃতির ক্ষেত্রে। ব্যাংককে যেমন তহবিল ও আমানাত সংগ্রহ করতে হয় তেমনি তা কাজে লাগিয়ে অর্থ উপার্জনও করতে হয়। আমানাত সংগ্রহ ও সংগৃহীত অর্থ ব্যবহার দু'টি ভিন্নধর্মী কাজ। প্রথমটির ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের পদ্ধতির সাথে সুদী ব্যাংকিং পদ্ধতির যথেষ্ট মিল রয়েছে। পার্থক্য যা তা অধিকাংশই আমানাতের শিরোনাম ও ব্যবহারগত। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রেই সুদী ব্যাংকের সাথে রয়েছে তার আমূল পার্থক্য।

তহবিল সংগ্রহের পদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংকের তহবিল সংগ্রহের পদ্ধতি সনাতন ব্যাংকের তহবিল সংগ্রহের পদ্ধতির অনুরূপ। এসবের মধ্যে রয়েছে– পরিশোধিত মূলধন, রিজার্ভ তহবিল, অন্যান্য সঞ্চিতি এবং অবন্টিত মুনাফা, ব্যাংকিং প্রথা হতে গৃহীত অর্থ এবং জনসাধারণের রক্ষিত আমানাত। এ সবের মধ্যে আমানাত সমাবেশের পদ্ধতি খুব গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। জনসাধারণের কাছ থেকে সঞ্চয় সংগ্রহের জন্য ইসলামী ব্যাংকের পদ্ধতি নীচে আলোচিত হলো।

(১) আল-ওয়াদিয়াহ পদ্ধতি : আমানাত সংগ্রহ বা সমাবেশের জন্য ইসলামী ব্যাংকের অনুসৃত আল-ওয়াদিয়াহ পদ্ধতি শারীয়াহ অনুমোদিত একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। আল-ওয়াদিয়াহ নামে যে হিসাবে অর্থ আমানাত রাখা হয় তা সুদভিত্তিক সনাতন ব্যাংকের চলতি হিসাবের অনুরূপ। এই হিসাবে জনগণ টাকা আমানাত রাখে প্রধানতঃ নিরাপত্তার জন্যই। এই হিসাবের সাধারণ কাজগুলো হলো :

(ক) আমানাতকারী কোন রকম বিধি-নিষেধ ছাড়াই যেকোন পরিমাণ অর্থ তার হিসাবে আমানাত রাখতে ও তুলতে পারে।

(খ) এই হিসাবে রাখা আমানাতে কোন মুনাফা বা লোকসান দেখানো হয় না; এবং

(গ) নিজস্ব ঝুঁকিতে ব্যাংক এই আমানাতের অর্থ নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারে।

(২) মুদারাবা পদ্ধতি : আমানাত সংগ্রহের জন্য এটিই ইসলামী ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। মুদারাবা হিসাবের অপর নাম লাভ-লোকসানের অংশীদারীত্বের হিসাব (Profit-and-Loss Sharing Account বা PLS হিসাব)। প্রকৃতিগত দিক থেকে এই হিসাব সনাতন ব্যাংকের সঞ্চয়ী হিসাবের সমতুল্য। এই হিসাবে ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে তাদের জমাকৃত অর্থের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে আমানাত গ্রহণ করে থাকে। এক্ষেত্রে উদ্ভূত মুনাফা পূর্ব নির্ধারিত একটা হারে ব্যাংক ও আমানাতকারীদের মধ্যে ভাগ হয়। সাধারণতঃ মুনাফার ৬৫% বা তদুর্ধ আমানাতকারীদের *(সাহিবুল মাল)* মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়। বাকীটা পায় ব্যাংক *(মুদারিব)*।

তবে যদি ব্যাংকের গাফলতিজনিত করণ ছাড়া লোকসান হয় তাহলে তা আমানাতকারীরাই বহন করবে। মুদারাবা হিসাব দুই ধরনের– সাধারণ ও মেয়াদী। প্রথমোক্ত হিসাবে সঞ্চয়ী হিসাবের মতোই আনানতকারীরা যেকোন পরিমাণ অংকের অর্থ জমা দিতে পারে, কিন্তু টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-নীতি মানতে হয়। মেয়াদী আমানাত ছয় মাস হতে এককালীন, সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত হতে পারে। উল্লেখ্য, মেয়াদ যত দীর্ঘ হতে মুনাফার প্রদত্ত হার ততবেশী হবে।

মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাব

মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে পরিচালনা করা যায় এবং একই সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের নানা ধরনের প্রয়োজনও পূরণ করা সম্ভব এমন বিশেষ ধরণের বেশ কিছু সঞ্চয়ী হিসাব চালু করেছে এ দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো। এধরণের বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাব পৃথিবীতে অন্যান্য দেশের ইসলামী ব্যাংকেও চালু রয়েছে। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই মধ্যবিত্ত ও চাকুরিজীবী শ্রেণীর লোকেরাই এসব সঞ্চয়ী হিসাবে অর্থ আমানাত করে। এসব স্বল্প কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় ব্যাংকের বিনিয়োগযোগ্য তহবিলও বৃদ্ধি করে এবং দীর্ঘ মেয়াদী ও বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য হওয়ায় ব্যাংকগুলো মুনাফা বন্টনের ক্ষেত্রে উঁচু ওয়েটেজ দিয়ে থাকে।

মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাবসমূহ

ক্ষুদ্র সঞ্চরকে উৎসাহ প্রদান এবং ইসলামপ্রিয় জ্ঞানের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন পূরণের জন্যে সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলো শারীয়াহসম্মত বেশ কয়েকটি মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয়ী প্রকল্প চালু করেছে। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো–

১। মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয়ী হিসাব

২। মুদারাবা বিশেষ (পেনশন) হিসাব

৩। মুদারাবা মাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়ী হিসাব

৪। মুদারাবা মোহর বিবাহ সঞ্চয়ী হিসাব

৫। মুদারাবা মিলিওনিয়ার সঞ্চয়ী হিসাব

৬। মুদারাবা সুপার সেভিংস সঞ্চয়ী হিসাব

৭। মুদারাবা মাসিক সঞ্চয়ী হিসাব

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে বিভিন্ন নামে উপরোক্ত বিশেষ মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবসমূহ পরিচালিত হয়ে আসছে। এসব হিসাবে প্রদত্ত মুনাফার ওয়েটেজের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

তহবিল বরাদ্দের পদ্ধতি

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, অর্থনৈতিক দিক থেকে চালু ও সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকে থাকতে হলে এবং অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে চাইলে ইসলামী ব্যাংক ও বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথেষ্ট পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে হবে। এর থেকেই তার নিজস্ব পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ মেটানো ছাড়াও শেয়ারহোল্ডার, বিনিয়োগকারী ও আমানাতকারীদের সন্তোষজনক হারে ডিভিডেন্ড ও মুনাফা দিতে হবে। এই সমুদয় কাজই করতে হবে শারীয়াহসম্মত উপায়ে। কিন্তু কিভাবে?

প্রচলিত সুদী ব্যাংকগুলো এমন অনেক উপায়ে উপার্জন করে যেগুলো শরী'য়াতের দৃষ্টিতে বৈধ। কিন্তু যেহেতু সেই আয় পৃথক করে না রেখে অন্যান্য সুদী আয়ের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয় সেহেতু তা শারীয়াহর দৃষ্টিতে আর হালাল বা বৈধ থাকে না। সুদী ব্যাংকের এসব আয়ের মধ্যে রয়েছে– নির্দিষ্ট সার্ভিস চার্জ বা 'উজরা'র (ফি ও কমিশন) বিনিময়ে জনসাধারণের জন্য নানা ধরনের সেবামূলক কাজ। উদাহরণস্বরূপ ডিমান্ড ড্রাফ্ট, পে-অর্ডার, ক্রেডিট কার্ড প্রভৃতি ইস্যু, বিভিন্ন বিলের অর্থপ্রদান, অর্থ সম্পদ হস্তান্তর, অন লাইন ব্যাংকিং লকার সার্ভিস, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ে সাহায্য প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে সুদভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের মোট আয়ের ৩০%-এরও বেশি এই ধরনের সেবামূলক কাজ হতে আয় করে থাকে। ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংকও এই ধরনের সেবা দেবে এবং সঙ্গতভাবেই তার মোট আয়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এই প্রথাগত কিন্তু হালাল উপায়ে উপার্জন করতে পারবে।

প্রশ্ন হলো, ইসলামী ব্যাংক কিভাবে তার তহবিল বিনিয়োগ করবে? সুদের ভিত্তিতে বিনিয়োগ ইসলামে নিষিদ্ধ, কিন্তু লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ শারীয়াহসম্মত। সুতরাং, ইসলামী ব্যাংক সুদের পরিবর্তে লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করেই উপার্জনের চেষ্টা করবে। বস্তুতঃপক্ষে ইসলামী ব্যাংকের সকল ধরনের আর্থিক সহযোগিতাই বিনিয়োগমূলক, সুদী ব্যাংকের মতো ঋণমূলক নয়। এভাবে বিনিয়োজিত অর্থ হতে প্রাপ্ত মুনাফা থেকেই ইসলামী ব্যাংক তার পরিচালনা ব্যয় নির্বাহ ছাড়াও শেয়ারহোল্ডার, বিনিয়োগকারী ও আমানাতকারীদের মুনাফা দেবে। বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে এবং তাদের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে কুড়িটি পদ্ধতি আর্থিক দিক দিয়ে সফল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই ব্যাংকগুলো শুধু যে আজ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে তাই নয়, বরং উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করে চলেছে। তাদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। শুধু মুসলিম দেশসমূহেই নয়, অমুসলিম দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকগুলোও একই পদাংক অনুসরণ করে চলেছে। এই পদ্ধতিগুলো সম্পূর্ণ ইসলামী শারীয়াহসম্মত। আলোচনার সুবিধার জন্য ইসলামী ব্যাংকের তহবিল ব্যবহারের পদ্ধতিগুলোকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হলো : (১) বিনিয়োগধর্মী পদ্ধতি (খ) বাণিজ্যসম্পৃক্ত পদ্ধতি, (গ) ইজারাধর্মী পদ্ধতি এবং (ঘ) ঋণধর্মী পদ্ধতি। এছাড়া রয়েছে সেবামূলক কাজ। সেসবের মাধ্যমেও ব্যাংকের উপার্জন হয়ে থাকে।

(ক) বিনিয়োগধর্মী পদ্ধতি :

বিনিয়োগধর্মী পদ্ধতিসমূহের মধ্যে রয়েছে মুদারাবা, মুশারাকা, সরাসরি বিনিয়োগ, বিনিয়োগ নীলাম, মেয়াদী অংশগ্রহণকারী সার্টিফিকেট, শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়, বৈদেশিক মুদ্রার উপস্থিত ক্রয়-বিক্রয়, মুজারাহ ও মুশাকাত।

১. মুদারাবা : মুদারাবা এমন একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি যেখানে দু'টি পক্ষ থাকে। একপক্ষ পুঁজির যোগান দেয় এবং অপরপক্ষ পুঁজির ব্যবহার করে। তাই, যে কারবারে একপক্ষ মূলধন যোগান দেয় এবং দ্বিতীয়পক্ষ শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করে কারবার পরিচালনা করে তাকে মুদারাবা বলে। যিনি মূলধন যোগান দেন তাকে 'সাহিবুল মাল' এবং যিনি বিনিয়োগ গ্রহণ করেন তাকে 'মুদারিব' বলে।

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB) মুদারাবার সংজ্ঞায় বলেছে,

Mudaraba is a form of partnership where one party *(Sahib al Maal)* provides the fund while the other provides the expertise and management. The latter is reffered to as the *Mudarib* (Manager). Any profit accrued is shared between the two parties on a pre-agreed basis, while capital loss is exclusively borne by the partner providing the capital *(Sahib al Maal).*

অর্থাৎ মুদারাবা এক ধরনের অংশীদারিত্ব যেখানে এক পক্ষ *(সাহিব আল-মাল)* তহবিল সরবরাহ করে এবং অন্যপক্ষ যোগান দেয় দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা। এই পরবর্তী জনকে বলা হয় *মুদারিব* (ব্যবস্থাপক)। যে মুনাফা উপার্জিত হয় তা দুই পক্ষের মধ্যে পূর্বসম্মত হারে ভাগ হয়। এক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহকারী *(সাহিব-আল-মাল)* পুঁজির লোকসানের পুরোটাই বহন করে।

পদ্ধতিটি জাযিরাতুল আরবে আইয়ামে জাহিলিয়াতেও চালু ছিল। ধনাঢ্য আরবরা মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনা করতেন। হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা)-এর অন্যতম উদাহরণ। বস্তুতঃ এই পদ্ধতির অনুসরণ করেই ইসলামী ব্যাংক কোন যৌথ উদ্যোগ বা কারবারে একাই প্রয়োজনীয় সমুদয় অর্থ সরবরাহ করে এবং উদ্যোক্তা (Entrepreneur) তার শ্রম, সময় ও অভিজ্ঞতা বিনিয়োগ করে থাকে।

এখানে ব্যাংককে বলা হয় *সাহিব আল-মাল* এবং তহবিল ব্যবহারকারী বা উদ্যোক্তাকে বলা হয় *মুদারিব*। এই পদ্ধতিতে ব্যাংক সরাসরি ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে অংশ নেয় না অথবা মুদারিবের কাজে হস্তক্ষেপ করে না। মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যাংক ও উদ্যোক্তা পূর্ব নির্ধারিত হারে (৭৫% : ২৫%; ৭০% : ৩০%; ৬০ : ৪০%; ৫০% : ৫০%; ৪৫% : ৫৫%; ৪০% : ৬০%; ইত্যাদি) লাভের অংশ ভাগ করে নেয়। মূলধনের পরিমাণের সাথে লাভের অংশ কোনক্রমেই সম্পর্কযুক্ত নয়। উপরন্তু কোন পক্ষই মুনাফার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নিতে পারবে না। তবে লোকসান হলে তার পুরোটাই ব্যাংক বহন করবে। এক্ষেত্রে মুদারিব বা উদ্যোক্তাকে হারাতে হয় তার সুনাম, শ্রম ও সময়, কোন আর্থিক লোকসান তাকে বহন করতে হয় না। অবশ্য যদি নিরপেক্ষ তদন্তে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, মুদারিবের গাফলতির জন্যই লোকসান হয়েছে তাহলে ব্যাংক লোকসানের পুরো দায়ভার বহনে সম্মত নাও হতে পারে।

মুদারাবা পদ্ধতির আবশ্যিক শর্তাবলী :

ক) সাহিব আল-মাল ও মুদারিবের মধ্যে লিখিত চুক্তি হতে হবে। চুক্তিতে মূলধনের পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।

খ) মূলধন নগদ অর্থের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে, পণ্য সামগ্রীকে মূলধন হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

গ) সমুদয় মূলধন মুদারিবের কাছে হস্তান্তর করতে হবে যেন মুদারিব নিজেই তা বিনিয়োগ করতে পারে।

ঘ) যদি সাহিব আল-মাল মুদারিবের সাথে সরাসরি ব্যবসায়িক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।

ঙ) কারবারের মুনাফায় মুদারিবের সুনির্দিষ্ট অংশের উল্লেখ থাকবে, কোন সুনির্দিষ্ট অংকের উল্লেখ থাকবে না।

চ) মুদারিব কারবারের মুনাফা হতেই তার অংশ পাবে, মূলধন হতে নয়। যদি কারবারে লোকসান হয় তবে কোন অবস্থাতেই মুদারিব মূলধন থেকে কিছু দাবী করতে পারবে না।

এই পদ্ধতি স্বনির্ভর সমাজ গঠনে উৎসাহ যোগায়। দক্ষ কিন্তু অসচ্ছল ব্যক্তিরা মুদারাবা পদ্ধতিতে নিজেদের কর্মসংস্থান করতে পারে। ফলে বেকার জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ব্যাংকও বিনা ঝামেলায় পুঁজি বিনিয়োগ ও মুনাফা উপার্জনের সুযোগ পায়। এসব সুবিধার জন্যই মুসলিম দেশ ছাড়াও পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে সম্প্রতি বহু মুদারাবাভিত্তিক বিনিয়োগ কোম্পানী গড়ে উঠেছে। এগুলো ক্রমেই সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব কোম্পানী ব্যবসায় সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইতিমধ্যে পরিচিতি লাভ করেছে।

২. **মুশারাকা** : ইসলামী ব্যাংকসমূহের তহবিল বরাদ্দ বা বিনিয়োগের এটিও শারীয়াহসম্মত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। সমাজেও পদ্ধতিটি সাধারণভাবে প্রচলিত চালু রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের শীর্ষস্থানীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের (IDB) সংজ্ঞা অনুসারে মুশারাকা বলতে বুঝায়–

"Musharaka is an Islamic financing technique that adopts 'equity sharing' as a means of financing projects. Thus, embraces

different types of profit and loss sharing partnerships. The partners (entreprenuers, bankers etc.) share both capital and management of project so that profits will be distributed among them according to agreed ratio and loss is shared as per their equity participation."

অর্থাৎ, মুশারাকা হলো এমন এক ইসলামী অর্থায়ন কৌশল যেখানে প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য মূলধনে অংশীদারিত্ব (বা ইক্যুইটি শেয়ারিং) পদ্ধতি অনুসৃত হয়। এভাবেই বিভিন্ন ধরনের লাভ-লোকসানের অংশীদারিভিত্তিক কারবার গড়ে ওঠে। অংশীদারগণ (উদ্যোক্তা, ব্যাংক ইত্যাদি) প্রকল্পের মূলধন ও ব্যবস্থাপনা উভয়েই অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে পূর্বস্বীকৃত অনুপাত অনুসারে মুনাফা বণ্টিত হয় এবং লোকসান বণ্টিত হয় মূলধনে তাদের অংশ অনুপাতে।

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) মুশারাকা বিনিয়োগের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তাহলো–

"...... a form of partnership between the Islamic bank and its clients whereby each party contributes to the capital of partnership in equal or varying degrees to establish a new project or share in an existing one, and whereby each of the parties becomes an owner of the capital on a permanent or declining basis and shall have his due share of profits."

অর্থাৎ, মুশারাকা হলো ইসলামী ব্যাংক এবং এর গ্রাহকদের মধ্যে এমন এক অংশীদারী কারবার যেখানে প্রত্যেক অংশীদার নতুন কোন প্রকল্প প্রতিষ্ঠা কিংবা বিদ্যমান কোন প্রকল্পে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে মূলধনে সমান কিংবা বিভিন্ন মাত্রায় অংশ নেয় এবং যেখানে প্রত্যেক অংশীদার স্থায়ী কিংবা হ্রাসমান ভিত্তিতে মূলধনের মালিক হয় এবং মুনাফার প্রাপ্য অংশ লাভ করে।

মুশারাকা পদ্ধতিতে ব্যাংক ও উদ্যোক্তা বা উদ্যোক্তাদের মধ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চুক্তি অনুসারে সুনির্দিষ্ট কারবার পরিচালিত হয়। আরবী পরিভাষায় একে বলা হয় *শিরকাতুল উকুদ।* ব্যাংকসহ সকল অংশীদারই পরস্পর সম্মত অংশ অনুসারে মূলধন সরবরাহ করে এবং স্বীকৃত অনুপাত অনুসারে মুনাফা ভাগ করে নেয়। লোকসান হলে অবশ্য প্রত্যেকে মূলধনের অনুপাতেই তার ভাগ নেয়। এই

পদ্ধতিতে বিনিয়োগের কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। যথা : অংশীদারগণ তাদের কারবারের যাবতীয় হিসাব সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করবে, অংশীদারদের নৈতিক মান উন্নত হবে এবং কারবারের/প্রকল্পের যথাযথ তদারকী ও পর্যবেক্ষণের জন্যও উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক জনশক্তি থাকতে হবে। পুঁজির প্রকৃতি অনুসারে *শিরকাতুল উকুদ* চার ধরনের হয়ে থাকে :

(ক) *শিরকাত আল-মুফাওয়াদা* (সমঅংশীদারী কারবার),

(খ) *শিরকাত আল-ইনান* (অসমঅংশীদারী কারবার),

(গ) *শিরকাত আল-সানায়ী* (পেশাভিত্তিক অংশীদারী কারবার), এবং

(ঘ) *শিরকাত আল-ওয়াজুহ* (সুনামভিত্তিক অংশীদারী কারবার)।

ক. শিরকাতুল মুফাওয়াদা (সমঅংশীদারি কারবার)

যে কারবারের অংশীদারগণ সমপরিমাণ পুঁজি যোগান দেয়, কারবারে সমভাবে অংশগ্রহণ করে এবং লাভ-লোকসান সমানভাবে ভাগ করে নেয়, তাকে শিরকাতুল মুফাওয়াদা বলে।

শিরকাতুল মুফাওয়াদার শর্তাবলী

১. এই কারবারে অংশীদারগণের মূলধন, শ্রম, দায়-দায়িত্ব ও লাভ-লোকসান সমান হয়।

২. অংশীদারগণ বালেগ, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ও স্বাধীন হবে।

৩. অংশীদারগণের মধ্যে কাফির বা অন্য ধর্মাবলম্বী থাকতে পারবে না। সবাইকে একই ধর্মের লোক হতে হবে।

৪. অংশীদারগণ লাভ-লোকসান সমানভাবে পাবেন।

৫. কারবারের অংশীদারগণ পরস্পরের প্রতিনিধি ও জামিনদার।

৬. কোনো অংশীদার অন্য অংশীদারের অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায় সম্পত্তি বন্ধক দিতে, কাউকে ঋণ দিতে, ইচ্ছামতো খরচ করতে, বিদেশ সফর করতে, দোকান বা অফিস ভাড়া দিতে কিংবা অংশীদারি চুক্তিতে অন্যের সাথে আবদ্ধ হতে পারবে না।

৭. অংশীদার দু'জন হলে একজনের মৃত্যুর পর অংশীদারি কারবারের বিলুপ্তি ঘটবে। দুইয়ের অধিক অংশীদারের বেলায় একজন বা কম সংখ্যক অংশীদারের মৃত্যু বা পাগল হওয়ার কারণে কারবারের বিলুপ্তি ঘটবে না।

৮. এই অংশীদারি কারবার থেকে কেউ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজনে কিছু গ্রহণ করলে তার মূল্য অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।

খ. শিরকাতুল ইনান (অসম অংশীদারি কারবার)

কোনো অংশীদারি কারবারে প্রত্যেক অংশীদারের মূলধন, লাভ, ব্যবসায়ে সময়দান ও দায়িত্ব-কর্তব্য যদি অসমান হয়, সেই অংশীদারি কারবারকে *শিরকাতুল ইনান* বলে। এ ক্ষেত্রে কারবারে লাভ হলে অংশীদারগণ অসমান লাভ নেয় এবং লোকসান হলে পুঁজির অনুপাতে তা বহন করে।

শিরকাতুল ইনানের শর্তাবলী

১. এই কারবারে অংশীদারগণের মূলধন, লাভ-লোকসান, শ্রম, দায়-দায়িত্ব সমান নয়।

২. অংশীদারগণ হবেন বালেগ ও সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী।

৩. অংশীদারগণ একই ধর্মের হওয়া জরুরি নয়।

৪. কারবারের মূলধন হবে নগদ মুদ্রা, স্বর্ণ বা রৌপ্য।

৫. কারবারের অংশীদারগণ পরস্পরের প্রতিনিধি বা জামিনদার নয়।

৬. কোনো অংশীদার অন্য অংশীদারের অনুমতি ব্যতীত ব্যবসার সম্পত্তি বন্ধক দিতে, কাউকে ঋণ দিতে, ইচ্ছামতো খরচ করতে, বিদেশ সফর করতে, কিংবা অংশীদারি চুক্তিতে অন্য কারো সাথে আবদ্ধ হতে পারবে না।

৭. অংশীদারগণের সংখ্যা দু'জন হলে এবং একজনের মৃত্যু হলে কিংবা পাগল হলে অংশীদারি কারবারের বিলুপ্তি ঘটবে। কিন্তু অংশীদারগণের সংখ্যা দু'জনের অধিক হলে এবং একজন বা কমসংখ্যক অংশীদারের মৃত্যু হলে বা পাগল হলে অংশীদারি কারবারের বিলুপ্তি ঘটবে না।

গ. শিরকাতুল সানায়ী বা আবাদান (পেশাভিত্তিক অংশীদারি কারবার)

যখন একই পেশার দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কোনো অংশীদারি পেশাভিত্তিক কারবার শুরু করে এবং কাজ থেকে প্রাপ্ত আয় চুক্তি অনুসারে ভাগ করে নেয়, তাকে *শিরকাতুল সানায়ী* বা আবাদান বলে। এই অংশীদারি কারবারে অংশীদারগণ পুঁজি বিনিয়োগ করে না বরং তাদের দক্ষতা ও শ্রম দিয়ে কারবারে অংশ নেয়। যেমন যদি দুই বা ততোধিক রাজমিস্ত্রি এই শর্তে চুক্তি করে যে, তারা সকলেই কাজ সংগ্রহ করে কাজটি সম্পাদন করবে এবং মজুরি সবাই নির্ধারিত হারে ভাগ করে নেবে তা হলে এ ক্ষেত্রে কারবারটি হবে *শিরকাতুল সানায়ী*। এ পদ্ধতিকে শিরকাতুল আবাদান বা শারীরিক শ্রমভিত্তিক অংশীদারি এবং *শিরকাতুল আমাল* বা শ্রমভিত্তিক অংশীদারিও বলা হয়।

শিরকাতুল সানায়ীর শর্তাবলী

১. এই কারবারে অংশীদারগণ একে অপরের প্রতিনিধি। অংশীদারগণ ব্যক্তিগত-ভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে নিয়োগকর্তার নিকট দায়ী থাকবে।

২. অংশীদারদের কেউ কাজ সংগ্রহ করলে তা সম্পাদন করা সকল অংশীদারের ওপর বাধ্যতামূলক।

৩. কারবারে অর্জিত মুনাফা বা পারিশ্রমিক চুক্তি মুতাবিক পূর্ব নির্ধারিত হারে অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টিত হবে। পারিশ্রমিক কম-বেশি হতে পারে এবং তা কাজের পরিমাণ, ঝুঁকি ও দায়িত্বের মাত্রার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে।

৪. কারবারে অংশীদারগণের সমপরিমাণ কাজ না ধরে সমপরিমাণ মুনাফা বা পারিশ্রমিক গ্রহণের চুক্তি অবৈধ হবে।

৫. চুক্তি মুতাবিক নিয়োগকর্তা যে কোনো অংশীদারকে মজুরি প্রদান করে বরখাস্ত করতে পারবেন।

৬. নিয়োগকর্তা ক্ষতিগ্রস্ত হলে অথবা অংশীদারগণ কর্তৃক মালামাল নষ্ট হলে অংশীদাররা দায়িত্ব অনুপাতে দায়ী হবেন।

ঘ. শিরকাতুল ওয়াজুহ (সুনামভিত্তিক অংশীদারি কারবার)

কোনো অংশীদারি কারবারে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যদি চুক্তিবদ্ধ হয় যে, তারা নগদ পুঁজি বিনিয়োগ করবে না বা করতে পারবে না, বরং পুঁজি ব্যতীত সুনাম,

পরিচিতি, মর্যাদা ও বিশ্বস্ততার ভিত্তিতে বাকিতে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে নগদে বিক্রি করবে এবং এতে যে লাভ-লোকসান হবে তা প্রত্যেকে পূর্ব নির্ধারিত হারে ভাগ করে নেবে, তা হলে এ ধরনের চুক্তিকে *শিরকাতুল ওয়াজুহ* বলে। অন্যকথায় বলতে গেলে, যখন অংশীদারগণ নগদ পুঁজি ছাড়া সুনাম, সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে পুঁজি করে কেবল বাকিতে পণ্য ক্রয় করে তা বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করে, আর তা ভাগাভাগি করার শর্তে কারবার শুরু করে, তাকে *শিরকাতুল ওয়াজুহ* বলে। এ ধরনের অংশীদারি কারবারে মুনাফা চুক্তিপত্র অনুযায়ী সমান সমান বা কম-বেশি করা যাবে, কিন্তু লোকসান হলে তার দায়-দায়িত্বও অংশ অনুপাতে প্রত্যেকে বহন করবে।

শিরকাতুল ওয়াজুহর শর্তাবলী

১. এই কারবারে মুনাফা চুক্তি মুতাবিক পূর্ব নির্ধারিত হারে (সমান সমান বা কম-বেশি) বণ্টিত হবে। তবে লোকসান অংশীদারগণ নিজ নিজ দায়-দায়িত্বের অংশ অনুপাতে বহন করবে।

২. কারবারের জন্য যে মাল ক্রয় করা হয়েছে, সে মালে অংশীদারগণ চুক্তি মুতাবিক তাদের অংশের অনুপাতে মালের মূল্যের জন্য দায়ী হবে।

৩. মালের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রকৃতি, মুনাফা বন্টন, লোকসান বহন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় চুক্তি মুতাবিক সম্পন্ন হবে। [১]

৩. সরাসরি বিনিয়োগ : ইসলামী ব্যাংক কারো সাহায্য না নিয়ে নিজেই কোন লাভজনক প্রকল্প বা আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় নানা ধরনের প্রকল্প স্থাপন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রকল্পের স্কীম তৈরি থেকে শুরু করে প্রকল্প বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ ব্যাংক নিজস্ব উদ্যোগেই করে থাকে। প্রকল্পের মূলধন সরবরাহ, নিয়ন্ত্রণ, পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং স্থায়ী মালিকানা সকল কিছুই ব্যাংকের নিজের হাতে থাকে। প্রকল্প বাস্তবায়নের পর লাভ হলে তার পুরোটাই ব্যাংকের। লোকসান হলে তারও পুরোটাই ব্যাংক বহন করে। পৃথিবীর

---

১. ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রিন্সিপাল পাবিলিশার্স, ঢাকা; ২০০৮ (পৃঃ ২৮২-২৮৪।)

বহু ইসলামী ব্যাংকের এ ধরনের নিজস্ব প্রকল্প রয়েছে। এসবের মধ্যে ডেইরী ফার্ম হতে এলুমিনিয়াম ও ফাইবার গ্লাস ফ্যাক্টরী, মাছ ধরার ট্রলার হতে গৃহায়ন প্রকল্প সবই রয়েছে।

৪. বিনিয়োগ নীলাম : বিনিয়োগ নীলাম ইসলামী পদ্ধতিতে বিনিয়োগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। শিল্পখাতে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক বিনিয়োগ বা সহযোগিতার জন্য এটি একটি কার্যকর পন্থা। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক একা কিংবা অন্যের সাথে যৌথভাবে শিল্প প্রকল্প প্রস্তুত করে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। এরপর ঐ প্রকল্পটি নীলামের ব্যবস্থা করে। অবশ্য প্রকল্পটি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ করেও ব্যাংক নীলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। যুক্তিসঙ্গত হারে লাভ ধরেই ব্যাংক প্রকল্পটির বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে থাকে। যে কোন দরপত্র বা নীলাম ডাক গ্রহণ বা বর্জনের অধিকারও ব্যাংকের থাকে। কৃতকার্য ক্রেতার নিকট থেকে ব্যাংক সম্পূর্ণ মূল্য নগদ গ্রহণ করতে পারে অথবা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ক্রেতাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুযোগ দিতে পারে। ইসলামী ব্যাংকের জন্য এটি একটি লাভজনক বিনিয়োগ কৌশল। দ্রুত শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও পুঁজি সংগঠনের জন্যও পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে সহায়ক।

৫. মেয়াদী অংশগ্রহণকারী সার্টিফিকেট : ইসলামী ব্যাংকগুলো আজ অবধি কখনও তারল্যের সমস্যায় পতিত হয়নি। বরং তাদের হাতে বিপুল অব্যবহৃত আমানাত পড়ে থাকে। এই অর্থ অনায়াসে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা যায়। উপরন্তু বহু ইসলামী ব্যাংক পাঁচ হতে দশ বছর মেয়াদী বিনিয়োগ সার্টিফিকেট ইস্যু করছে যাতে গৃহ নির্মাণ, স্থাবর সম্পত্তির উন্নয়ন, শিল্প কারখানা স্থাপন প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণ করা যায়। একে "মুদারাবা বন্ড" হিসাবেও অভিহিত করা হয়। এই ধরনের সার্টিফিকেট ন্যূনতম এক বছরের পূর্বে ভাঙ্গানো যায় না। লাভ-লোকসানের অংশীদারীত্বের শর্ত থাকে বলেই ক্রেতারা যেমন মুনাফা আশা করে তেমনি লোকসানের অংশ নিতেও প্রস্তুত থাকে। দেখা গেছে এসব বিনিয়োগে মুনাফাই হয়ে থাকে। অভিজ্ঞতায় আরও লক্ষ্য করা গেছে, ইসলামী ব্যাংকসমূহ এই ধরনের সার্টিফিকেট ক্রেতাদের সরকার ঘোষিত ন্যূনতম নিশ্চিত বা গ্যারান্টিযুক্ত সুদের চেয়েও বেশি হারে মুনাফা প্রদান করেছে। এ থেকে এই

ধরনের বিনিয়োগে ইসলামী ব্যাংকের সাফল্য সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়। মধ্যপ্রাচ্য, পাকিস্তান ও মালয়েশিয়ায় তো বটেই বাংলাদেশেও পদ্ধতিটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

৬. শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় : ইসলামী ব্যাংক শেয়ার বাজারে শেয়ার কেনা-বেচায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে এবং কার্যতঃ নিচ্ছেও। যথাযথভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হলে এটিও ব্যাংকের বিনিয়োগ ও আয়ের অন্যতম উৎস হওয়া সম্ভব। সুপ্রতিষ্ঠিত, সুপরিচালিত ও সন্তোষজনক হারে ডিভিডেন্ড দিতে সক্ষম এমন সরকারী ও বেসরকারী যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন বা কোম্পানীর স্টক ও শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক তহবিল বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করতে পারে। তবে এই ব্যাংক যেহেতু শুধুমাত্র হালাল ব্যবসায়ে অংশগ্রহণ করতে পারে সেহেতু শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং দেখতে হবে এসব কোম্পানীর কার্যক্রম শারীয়াহসম্মত কি না। অর্থাৎ, এদের লেনদেনে সুদের সংশ্রব আছে কিনা এবং কার্যক্রমে হালাল-হারামের বাছ-বিচার করে কি না। যদি তা না হয় তাহলে ঐসব কোম্পানীর শেয়ার কেনা-বেচায় অংশ নেওয়া যাবে না।

৭. বৈদেশিক মুদ্রার উপস্থিত ক্রয়-বিক্রয় : ইসলামী ব্যাংক খোলা বাজার হতে বৈদেশিক মুদ্রা কিনে আবার তা খোলা বাজারেই বিক্রয় করতে পারে। এ থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জনের সুযোগ রয়েছে। শারীয়াহর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার স্বার্থে বৈদেশিক মুদ্রা উপস্থিত ক্রয় বা বিক্রয় করতে হবে এবং তা অবশ্যই নগদ মূল্যে হতে হবে। বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কঠোর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। কিন্তু অন্যান্য দেশে বিশেষতঃ মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপীয় দেশগুলোতে এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ নেই। তাই সেসব দেশের ইসলামী ব্যাংক এই ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করছে এবং এ থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জন করছে। কোন কোন ব্যাংকের মোট আয়ের এক-তৃতীয়াংশ অর্জিত হচ্ছে এই একটি মাত্র পদ্ধতি থেকেই।

৮. মুজারাহ : এই পদ্ধতিতে ব্যাংক যদি কোন কৃষি জমির মালিক বা অন্য কোনভাবে স্বত্বাধিকারী হয় তাহলে তা চাষ করার জন্য কৃষকদের সাথে চুক্তি

করতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যাংক *(মোজারে)* নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ডটি কৃষককে *(আমেল)* চাষের জন্য দেবে। বিনিময়ে ব্যাংক নির্ধারিত হারে উৎপাদিত ফসলের অংশ পাবে। চুক্তির মধ্যেই উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণাগুণ বৃদ্ধির জন্য উন্নতমানের বীজ, সার, সেচ সুবিধা, পরিবহন ও কৃষি সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। অবশ্য এজন্য ফসলের প্রাপ্য হারেরও তারতম্য হবে।

৯. মুশাকাত : এই পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক তার মালিকানাধীন অথবা কোন না কোনভাবে স্বত্ত্বাধীন বৃক্ষ, ফলের বাগান ইত্যাদির পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কৃষককে দায়িত্ব অর্পণের জন্য চুক্তি করে। উৎপন্ন ফল বা কাঠ উভয়ের মধ্যে চুক্তি অনুসারে বণ্টিত হয়। মুজারাহ্ পদ্ধতির মতো এ ক্ষেত্রে সেচ, পরিবহন বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহের সুবিধা প্রদান এবং সেই অনুসারে ফসলের অংশ প্রাপ্তির শর্তের তারতম্য হতে পারে। পদ্ধতিটি ইরানে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

(খ) বাণিজ্যধর্মী পদ্ধতি

এই পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে মুরাবাহা, বায়ই সালাম, বায়ই মুয়াজ্জাল, ইসতিসনা, কিস্তিতে বিক্রয় এবং জু'আলাহ।

১০. মুরাবাহা : ইসলামী অর্থনীতিতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ ও সর্বজনগ্রাহ্য পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের পণ্য সামগ্রীর আমদানী-রপ্তানী ও ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায়ে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে। ব্যাংক সাধারণতঃ আগ্রহী ক্রেতার চাহিদা মুতাবিক পণ্য ক্রয় করে তার সাথে একটা মুনাফা ("মার্ক আপ' নামে সচরাচর পরিচিত) যুক্ত করে তার কাছেই সেটা বিক্রয় করে দেয়। ইসলামী শারীয়াহর দৃষ্টিতে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণ বৈধ।

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক মুরাবাহার সংজ্ঞায় বলেছে–

"Murabaha is a contract between a buyer and a seller at a higher price than the original price at which the seller bought the goods as a financing techinque. It involves the purchase by the seller (financier) of certain goods needed by the buyer and their re-sale to the buyer on cost-plus basis. Both the profit (mark up) and the time of repayment (usually in installments) are specified in the initial contract."

অর্থাৎ, মুরাবাহা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে এমন এক চুক্তি যেখানে অর্থায়নের কৌশল হিসেবে বিক্রেতা মূল যে মূল্যে পণ্যটি ক্রয় করেছিল তার চেয়ে উচ্চতর মূল্যে পণ্যটি বিক্রয় করে। এই পদ্ধতিতে বিক্রেতাকে (ফাইন্যানসিয়ার) ক্রেতার প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট পণ্যটি ক্রয় করতে হয় এবং ক্রেতার কাছেই তা মুনাফা সংযুক্ত করে বিক্রয় করতে হয়। লাভ (মার্ক-আপ) এবং মূল্য পরিশোধের সময় (সাধারণতঃ কিস্তিতে) উভয়ই প্রাথমিক চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

বাহরাইনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা Accounting and Auditing Organization for Islamic Finacial Institutions (AAOIFI) প্রদত্ত মুরাবাহার সংজ্ঞা নিম্নরূপ –

"*Murabaha* is selling a commodity as per the purchasing price with a defined and agreed profit mark-up. This mark-up may be a percentage of the selling price or a lump sum. This transaction may be concluded either without a prior promise to buy, in which case it is called an ordinary *Murabaha,* or with a prior promise to buy submitted by a person interested in acquiring goods through the institution, in which case it is called a 'banking Murabaha' i.e. *Murabaha to* the purchase orderer. This transaction is one of the trust-based contracts that depends on transparency as to the actual purchasing price or cost price in addition to common expenses.

অর্থাৎ, মুরাবাহা হলো ক্রয়মূল্যের সাথে সুনির্দিষ্ট ও সম্মত মুনাফাসহ (মার্ক-আপ) কোন পণ্য বিক্রয়। এই মার্ক-আপ বিক্রয় মূল্যের শতকরা হারও হতে পারে, অথবা হতে পারে থোক একটা অংক। পণ্য ক্রয়ের জন্য পূর্বা কোন প্রতিজ্ঞা ছাড়াই এ ধরনের লেনদেন হলে তাকে বলা হবে সাধারণ মুরাবাহা। কিন্তু কোন আগ্রহী ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পণ্যক্রয়ের জন্য ওয়াদা করলে এ ধরণের

লেনদেনকে বলা হবে ব্যাংকিং মুরাবাহা অর্থাৎ, ক্রেতার ফরমায়েশের ভিত্তিতে মুরাবাহা। এই লেনদেন হলো আস্থানির্ভর চুক্তি যা নির্ভর করে প্রকৃত ক্রয়মূল্য বা খরচের সাথে সাধারণ ব্যয় সংযুক্তির স্বচ্ছতার উপর।

মুবারাহা বিনিয়োগের আবশ্যিক শর্তাবলী :

ক) ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষই দ্রব্য সামগ্রীর মূল ক্রয়মূল্য সম্বন্ধে অবহিত থাকবে।

খ) উভয়পক্ষ অন্তর্নিহিত মুনাফার পরিমাণ বা হার সম্বন্ধে অবহিত থাকবে।

গ) মূল ক্রয়মূল্য এবং নির্ধারিত বিক্রয়মূল্যের মধ্যে সুদের কোন অংশ বা সংশ্রব থাকবে না। পণ্যের প্রকৃতি, পরিমাণ, গুণাগুণ, সরবরাহের স্থান ও সময় প্রভৃতির সুনির্দিষ্ট উল্লেখ থাকবে।

ঘ) ব্যাংক গ্রাহকের নিকট বিক্রির উদ্দেশ্যে পণ্যের মূল্য নির্ধারণের সময়ে ক্রয়মূল্য ছাড়াও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচও যোগ করার এখতিয়ার রাখে।

ঙ) চুক্তি সম্পাদনের সময়ে পণ্যের অস্তিত্ব থাকতে হবে এবং ক্রয়যোগ্য হতে হবে।

চ) চুক্তিবদ্ধ পণ্যের বাজার দর কমে গেলেও ক্রেতাকে পূর্ব নির্ধারিত মূল্যই পরিশোধ করতে হবে।

ছ) বাজার দর বাড়লেও ব্যাংক পণ্যের বিক্রয়মূল্য বাড়াতে পারবে না এবং চুক্তি বহাল থাকা পর্যন্ত অন্য কোথাও বিক্রি করতে পারবে না।

জ) চুক্তিবদ্ধ বিনিয়োগ গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালামালের সরবরাহ নিতে ও মূল্য পরিশোধে বাধ্য থাকে।

ঝ) বিক্রয় চুক্তির শর্তাবলী স্বীকৃত ও স্বাক্ষরিত হয়ে যাবার পর আর কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন অনুমোদনযোগ্য নয়।

ঞ) বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট পণ্য বিক্রয় ও সরবরাহের পূর্ব পর্যন্ত পণ্যের যাবতীয় ঝুঁকি ব্যাংক বহন করে। বিক্রয় ও সরবরাহ সম্পন্ন হওয়ার পর যাবতীয় ঝুঁকি বিনিয়োগ গ্রাহকের।

ট) বিক্রিতব্য দ্রব্যটি এক মুহূর্তের জন্য হলেও ব্যাংকের মালিকানায় থাকতে হবে।

ক্রেতা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাংকের নিকট থেকে একবারে কিংবা কিস্তিতে পণ্যটি পূর্ব নির্ধারিত মূল্যেই ক্রয় করবে। চুক্তিতে নির্ধারিত মুনাফা কোনভাবেই

বৃদ্ধি করা যাবে না, এমনকি গ্রাহক যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্যটির ডেলিভারী নাও নেয়। এই পদ্ধতিতে যদি পণ্য সামগ্রী তাৎক্ষণিক ক্রয়-বিক্রয় হয় তাহলে হবু ক্রেতাকে কোন সিকিউরিটি বা জামানত দিতে হয় না, অথবা মূল্যের কোন অংশ পূর্বা□ই আমানাত হিসেবে ব্যাংকে জমা রাখতে হয় না। শুধু একটা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হয় যেন হবু ক্রেতার পক্ষে ব্যাংকই বিক্রয়ের ঝামেলা বা দায় সম্পন্ন করতে পারে এবং সঙ্গত কোন কারণে হবু ক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্যটি কিনতে অপারগ হলে ব্যাংক ঐ পণ্য অন্যের কাছে বিক্রি করে দিতে পারে।

মুরাবাহার প্রকারভেদ

মূল্য পরিশোধের দিক থেকে মুরাবাহা দু'প্রকার। যথা :

১. মুরাবাহা বিন নকদ ও

২. মুরাবাহা বিল আজল।

১. মুরাবাহা বিন নকদ : যে মুরাবাহার সম্মত মূল্য তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা হয় তাকে *মুরাবাহা বিন নকদ* বলে।

২. মুরাবাহা বিল আজল : যে মুরাবাহার ক্ষেত্রে সম্মত মূল্য বিলম্বে পরিশোধ করা হয় তাকে *মুরাবাহা বিল আজল* বলে।

এদেশে বিদ্যমান ব্যাংকিং আইনের আওতায় কোন ব্যাংকই সরাসরি পণ্য বাণিজ্যে নিয়োজিত হতে পারে না। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপের ইসলামী ব্যাংকগুলো অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক পণ্য বাণিজ্যে সরাসরি অংশগ্রহণ করছে। এটি ইসলামী ব্যাংকের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। বিশ্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংকসমূহের মোট বিনিয়োগের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি সম্পন্ন হয়ে থাকে এই পদ্ধতিতে।

১১. বায়-ই-সালাম (অগ্রিম ক্রয়): বায়ই সালাম ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পাদিত এমন একটি চুক্তি যার আওতায় বিক্রেতা কোনো নির্দিষ্ট পণ্য বা উৎপাদিত বস্তু ক্রেতার কাছে একটি সম্মত মূল্যে বিক্রি করে। ক্রেতা চুক্তি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে তার মূল্য পরিশোধ করে, কিন্তু ভবিষ্যতের কোনো নির্দিষ্ট সময়ে এবং কোনো নির্দিষ্ট স্থানে পণ্যের স্থিরীকৃত আকার, গুণ ও পরিমাণ অনুযায়ী পণ্য সরবারাহ নিয়ে থাকে। অর্থাৎ, ভবিষ্যতের নির্ধারিত কোনো সময়ে

সরবরাহের শর্তে এবং তাৎক্ষণিক সম্মতমূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট পরিমাণ শারীয়াহ অনুমোদিত পণ্যসামগ্রী অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করাকে বায়ই সালাম বলে। বায়ই সালাম বিনিয়োগের বেলায় পণ্যের মূল্য তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা হয় এবং কাঙ্খিত পণ্য ভবিষ্যতের কোন নির্দিষ্ট তারিখে সরবরাহ করা হয়।

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) বায়ই সালামের যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা হলো–

"A salam transaction is the purchase of a commodity for deffered delivery in exchange for immediate payment, It is a type of sale in which the price, known as the salam capital, is paid at the time of contracting while the delivery of the item to be sold, known as al-*Muslam fihi* (the subject matter of a salam contract), is deffered. The seller and the buyer are known as *al-Muslam ilaihi* and *al-Muslam* or Rabb al-Salam respectively."

অর্থাৎ, সালাম লেনদেন হলো কোন পণ্য বিলম্বে সরবরাহের বিপরীতে তার মূল্য তাৎক্ষণিক পরিশোধ। এটা এমন এক ধরনের বিক্রয় যেখানে চুক্তি সম্পাদনের সময়েই মূল্য, যা সালাম মূলধন নামে পরিচিত, পরিশোধিত হয় কিন্তু বিক্রীতব্য পণ্যটির, যা *আল্-মুসলাম ফিহি* (অর্থাৎ সালাম চুক্তির বিষয়বস্তু) হিসাবে পরিচিত, সরবরাহ বিলম্বিত হয়। বিক্রেতা ও ক্রেতা যথাক্রমে *আল-মুসলাম ইলাইহি* এবং আল-মুসলাম বা রব আল-সালাম হিসেবে পরিচিত।

বায়ই সালাম বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্য

১. এ পদ্ধতিতে অর্থায়নের সময় পণ্যসামগ্রীর অস্তিত্ব থাকে না। যদি পণ্যসামগ্রী বিক্রির জন্য প্রস্তুত থাকে তা হলে বায়ই-সালাম হয় না। এসব ক্ষেত্রে বায়ই-মুয়াজ্জাল বা মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করতে হবে।

২. একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিক্রেতা পণ্য সরবরাহ করে।

৩. সরবরাহের সময়, স্থান ও পণ্যমূল্য ক্রেতা ও বিক্রেতার কাছে আগে থেকেই জানা থাকবে।

৪. পণ্য সরবরাহের নিরাপত্তার জন্য ক্রেতা (ব্যাংক) বিক্রেতার (গ্রাহকের) কাছ থেকে বা তার পক্ষে তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে ব্যক্তিগত ও অন্যান্য জামানত নিতে পারে।

৫. বায়ই সালামের পণ্য/মাল পরিমাণযোগ্য, ওজনযোগ্য, গণনাযোগ্য ও পরিমাপযোগ্য হতে হবে।

বায়-ই সালামের শর্তাবলী

১. চুক্তি বৈধ হওয়ার স্বার্থে চুক্তিপত্রে পণ্যের ধরন, পরিমাণ, গুণাগুণ বা বৈশিষ্ট্য, সরবরাহের স্থান, পরিবহন খরচ, গুদামভাড়া, এরুক প্রতি দাম এবং মোট দাম ইত্যাদি যাবতীয় শর্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

২. পণ্য সরবরাহের সময় ও স্থান সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

৩. চুক্তি সম্পাদনের সময় মালের মূল্য বিক্রেতাকে সম্পূর্ণ পরিশোধ করতে হবে।

৪. চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে পণ্যের সরবরাহ কিস্তিতে বা এককালীন দেয়া যেতে পারে।

৫. বিক্রেতা পণ্য পুরো বা আংশিক সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে অগ্রিম গৃহীত সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

৬. এ পদ্ধতিতে পণ্যের মূল্য ও মুনাফা পৃথকভাবে উল্লেখ করা জরুরি নয়।

উল্লেখ্য, কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বা নমুনার কৃষিজাত পণ্য বা কোনো নির্দিষ্ট কৃষিখামারের পণ্যের উপর বায়ই সালাম হয় না। কারণ, কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের বা নমুনার শস্য উৎপাদন অনিশ্চিত। ফসলের রং, আকৃতি, গুণাগুণ ইত্যাদির পরিবর্তন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই এধরনের কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে বায়ই সালাম পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে না।

১২. বায়-ই-মুয়াজ্জাল (বাকীতে বিক্রয়) : এই পদ্ধতিতে বিক্রেতা (ব্যাংক বা বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান) ক্রেতার পক্ষে পণ্য সামগ্রী ক্রয় বা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট মূল্যে তার কাছে বিক্রয়ের চুক্তি করে। ক্রয়মূল্য পরিশোধের পূর্বেই পণ্য সামগ্রী ক্রেতার মালিকানায় চলে যায়।

বায়-ই-মুয়াজ্জাল বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্য

ক. এ পদ্ধতিতে বিক্রেতা ক্রেতাকে পণ্যের ক্রয়মূল্য, লাভের পরিমাণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ জানাতে বা চুক্তিপত্রে উল্লেখ করতে বাধ্য নয়। কেবল বিক্রয়মূল্য উল্লেখই যথেষ্ট।

খ. এই ব্যবস্থায় নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য নির্দিষ্ট সময়ের পরে একসাথে বা কিস্তিতে পরিশোধ করার সুযোগ রয়েছে।

গ. চুক্তিপত্রে পণ্যের ধরন, গুণাগুণ, পরিমাণ, সরবরাহের স্থান ও সময়, গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধের সময়সীমা ও পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

ঘ. বায়-ই-মুয়াজ্জাল চুক্তি সম্পাদনের সময়ে অবশ্যই পণ্যের অস্তিত্ব থাকতে হবে এবং ক্রয়যোগ্য হতে হবে।

ঙ. চুক্তিপত্রে নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য কোন অবস্থাতেই হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যাবে না।

অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অর্থ যোগানোর জন্যও এ পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসূ। শিল্প ও কৃষিক্ষেত্রেও পদ্ধতিটি উপযোগী। ব্যাংক কৃষকদের সার, বীজ, কীটনাশক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এই ব্যবস্থায় সরবরাহ করতে পারে। কৃষকেরা শস্য কাটার পর বা অন্য কোন নির্দিষ্ট সময়ে এই অর্থ পরিশোধ করতে পারে। বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংক সাফল্যের সাথে পদ্ধতিটি ব্যবহার করছে।

১৩. ইসতিসনা বা ফরমায়েশের ভিত্তিতে উৎপাদন ও ক্রয় : এ পদ্ধতিতে ব্যাংক কোন প্রতিষ্ঠান বা উৎপাদনকারীকে ফরমায়েশমত কোন জিনিস নির্দিষ্ট মূল্যে নির্ধারিত সময়ে তৈরি বা উৎপাদন করে সরবরাহের প্রস্তাব করলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ তা মেনে নিলে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত বলে গণ্য হয়।

ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক ইসতিসনার সংজ্ঞা দিয়েছে এভাবে–

"Istisna is a contract for manufacturing (or construction) whereby the manufacturer (seller) agrees to provide the buyer with goods identified by description after they have been manufactured or constructed in conformity with that description within a certain time and for an agreed price."

অর্থাৎ, ইসতিসনা হলো উৎপাদনের (বা নির্মাণের) চুক্তি যেখানে উৎপাদনকারী (বিক্রেতা) বর্ণনা দ্বারা সনাক্তকৃত পণ্য ঐ বর্ণনার সাথে সাযুজ্যপূর্ণ করে উৎপাদন (বা নির্মাণ) করার পর নির্দিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে স্বীকৃত মূল্যে ক্রেতাকে সরবরাহ করতে সম্মত হয়।

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) প্রদত্ত -ইসতিসনার সংজ্ঞা হলো–

"Istisna'a is a contract of sale of specified items to be manufactured or constructed, with an obligation on the part of the manufacturer or builder (contractor) to deliver them to the customer upon completion."

অর্থাৎ, ইসতিসনা হলো সুনির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদন বা নির্মাণ করে বিক্রয়ের চুক্তি যেখানে উৎপাদনকারী বা নিমার্তা (ঠিকাদার) পণ্যটি তৈরি বা নির্মাণ সম্পন্ন হলেই তা গ্রাহককে সরবরাহ করতে বাধ্য থাকে।

ইসতিসনার বৈশিষ্ট্য

১. চুক্তি মালের অস্তিত্ব ছাড়াই ইসতিসনা সম্পন্ন হয়ে থাকে। মালামাল প্রস্তুত করা থাকলে তা ইসতিসনার আওতায় কেনাবেচা বৈধ নয়। তখন বায়ই-মুয়াজ্জাল বা মুরাবাহা পদ্ধতি প্রযোজ্য।

২. ইসতিসনার ক্ষেত্রে বায়ই-সালামের মতো পণ্যের মূল্য তাৎক্ষণিক পরিশোধ করা জরুরি নয়। মূল্য অগ্রিম বা কিস্তিতেও পরিশোধ করা যায়।

৩. ফরমায়েশকৃত দ্রব্যসামগ্রীর দাম, পরিমাণ, প্রকৃতি, গুণাগুণ ইত্যাদি চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। ফলে ভবিষ্যতে উৎপাদনকারী *(সানী)* এবং ফরমায়েশ দাতার *(মুসতাসনি)* মধ্যে বিরোধ দেখা দেওয়ার পথ রুদ্ধ হয়।

৪. চুক্তি সম্পাদনের পর কোন পক্ষই একতরফাভাবে শর্তের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন বা এককভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারবে না। প্রকৃতিগতভাবে তাই ইসতিসনা চুক্তি চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয়।

৫. ফরমায়েশকৃত পণ্যের সম্পূর্ণ বা আংশিক মূল্য লেনদেন সম্পন্ন হয়ে থাকলে অথবা উৎপাদন কাজ শুরু হয়ে থাকলে কোনো পক্ষই চুক্তি বাতিল করতে পারে না।

৬. ইসতিসনা চুক্তিতে সম্মত দাম উল্লেখ থাকতে হবে। পণ্যের দাম কখন কিভাবে পরিশোধ করতে হবে তাও চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে।

৭. পণ্য কোথায়, কিভাবে, কার খরচে সরবরাহ হবে তাও চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে।

ইসতিসনার শর্তাবলী

১. শারীয়াহর নীতি অনুযায়ী ইসতিসনার অন্যতম শর্ত হচ্ছে চুক্তি। এ ক্ষেত্রে আদেশের ভিত্তিতে মালামাল তৈরি করে নেয়া বা বানানো হয়। এ পদ্ধতিতে মালামাল সরবরাহ বিলম্বিত হয় এবং মূল্য পরিশোধ তাৎক্ষণিক, বিলম্বে অথবা কিস্তিতে হতে পারে।

২. ফরমায়েশকৃত পণ্যের নাম, বিবরণ, পরিমাণ, গুণাগুণ, আকার, একক প্রতি দাম, মোট দাম ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে।

৩. পণ্য সরবরাহের সময় ও স্থান সুনির্দিষ্ট হবে।

৪. মূল্য তাৎক্ষণিক পরিশোধিত না হলে পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

৫. পণ্যের পরিবহন, বীমা, গুদামজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে যদি কোনো শর্ত থাকে তবে তা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে হবে।

৬. চুক্তিতে উল্লেখ থাকলে মালামাল সরবরাহ কিস্তিতে অথবা চুক্তির মেয়াদের মধ্যে এককালীন দেয়া-নেয়া যেতে পারে।

৭. চুক্তির শর্তানুযায়ী সম্পূর্ণ অথবা আংশিক মালামাল সরবরাহ দিতে বিক্রেতা ব্যর্থ হলে অগ্রিম গৃহীত সম্পূর্ণ অথবা আনুপাতিক আংশিক মূল্য ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

৮. এ পদ্ধতিতে শুধু মোট মূল্যের উল্লেখ থাকলেই চলে; উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফা পৃথকভাবে দেখানো জরুরি নয়।

ইসতিসনা ও বায়-ই-সালামের মধ্যে পার্থক্য

ইসতিসনা	বায়-ই সালাম
১. পণ্যের নির্ধারিত মূল্য মেয়াদের মধ্যে যে কোনো সময় এককালীন, কিস্তিতে, ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ে এককালীন, মেয়াদের পরে নির্ধারিত কিস্তি ইত্যাদি শর্তে পরিশোধিত হতে পারে।	১. চুক্তি সম্পাদনের সময় পণ্যের সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়।
২. ফরমায়েশ অনুযায়ী পণ্য তৈরি করে সরবরাহ করতে হয়।	২. পণ্য উপাদান আবশ্যিক নয়। অন্য উপায়ে পণ্য সংগ্রহ করেও সরবরাহ করা যায়।
৩. উৎপাদন শুরুর পূর্বে যে কোনো পক্ষ এককভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারে।	৩. চুক্তি একবার কার্যকর হলে তা কোনো পক্ষ এককভাবে বাতিল করতে পারে না।
৪. পণ্য সরবরাহের সময় নির্দিষ্ট না করলেও চলে।	৪. পণ্য সরবরাহের সময় নির্ধারণ চুক্তির অপরিহার্য শর্ত।

১৪. কিস্তিতে বিক্রয় : ইসলামী ব্যাংকসমূহের তহবিল ব্যবহারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো কিস্তিতে বিক্রয়। এ পদ্ধতিতে স্বল্প আয়ের লোকদের, বিশেষতঃ চাকুরীজীবীদের কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে ব্যাংক গৃহস্থালীর নানাবিধ আসবাবপত্র, ইলেকট্রনিক ও ইলেকট্রিক সামগ্রী [যেমন এয়ারকুলার রেফ্রিজারেটর] প্রভৃতি সরবরাহ করে থাকে। ফলে স্বল্প আয়ের লোকেরা এবং নতুন সংসার শুরু করছে এমন দম্পতিরা যেমন উপকৃত হয় তেমনি ব্যাংকও তহবিল বিনিয়োগের মাধ্যমে উপার্জনের উপায় করে নেয়।

১৫. জু'আলাহ : জু'আলাহ প্রকৃতিতে অনেকটাই ইসতিসনার মতো। ইসতিসনায় বিক্রেতা দ্রব্য সামগ্রী বা পণ্য সরবরাহ করে, জু'আলাহতে বিক্রেতা সেবা সরবরাহ করে থাকে। বিক্রেতা নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় ধরে সেবা প্রদান বা সরবরাহ করে থাকে। এক্ষেত্রে নিয়োগকারীকে বলা হয় *জায়েল*, স্বীকৃত মজুরী বা

দেয় অর্থকে বলা হয় *জোআল* এবং সরবরাহকারী বা ঠিকাদারকে বলা হয় *আমেল*। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রয়োজনীয় বাণিজ্যিক বা অন্যান্য সেবামূলক কাজ সম্পাদনের দায়িত্ব গ্রহণ করে ব্যাংক নিজেই আমেল-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। যেক্ষেত্রে ব্যাংক এধরনের ভূমিকা নেবে সেক্ষেত্রে জু'আলাহ চুক্তিতে অন্য কাউকে ব্যাংক আমেল হিসেবে নিয়োগের ক্ষমতা রাখে এমন ব্যবস্থাও থাকতে পারে। এটি হতে পারে মূল চুক্তির আওতায় সহযোগী চুক্তি। অনুরূপভাবে ব্যাংক যখন জায়েল তখন মূল আমেল ব্যাংকের পূর্ব অনুমতি নিয়ে কাউকে সহযোগী আমেল হিসেবে নিয়োগ দিতে পারে। সেবা প্রদানের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমেল বা জায়েল যে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব গ্রহণ করবে তাও সংশ্লিষ্ট চুক্তিতে উল্লেখ থাকতে পারে।

(গ) ইজারাধর্মী পদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংকসমূহ অনুসৃত এই পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে সাধারণ ইজারা বা লীজ, ইজারা বিল-বায়ই, এবং ইজারা বিল বায়ই তাহতা শিরকাতিল মিলক।

১৬. ইজারা : মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য ইজারা একটি বিশেষ কৌশল। এই পদ্ধতিতে সম্পদের মালিকানা ইজারাদারেরই (এক্ষেত্রে ব্যাংকের) থাকে। ইজারাগ্রহীতা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট অর্থ প্রদানের চুক্তিতে ইজারাকৃত সম্পত্তি ব্যবহার ও ভোগ দখল করে থাকে। এই পদ্ধতিতে ইজারাদাতা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে পণ্যের সূত্রে প্রাপ্ত ইজারার অর্থ থেকে তার মূলধন ব্যয় পূরণ করে মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়। এ প্রক্রিয়ায় ঝুঁকিও অনেক কম। ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিশেষ সাফল্যের সাথে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আসছে। এর ফলে শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহও পুঁজিনিবিড় মূলধন সামগ্রী ব্যবহার করার সুযোগ পায়। উদাহরণস্বরূপ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক পণ্যবাহী জাহাজ, তেলবাহী ট্যাংকার, রেলওয়ে ওয়াগন, মাছ ধরার ট্রলার, দামী ও অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম প্রভৃতি আগ্রহী প্রতিষ্ঠানের কাছে, ক্ষেত্রবিশেষে উন্নয়নশীল মুসলিম দেশের সরকারের কাছেও ইজারা দিচ্ছে।

১৭. ইজারা বিল-বায়ই (ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া) : এ পদ্ধতিতে ব্যাংক সম্পূর্ণ নিজস্ব তহবিল দিয়ে গ্রাহকের ফরমায়েশ অনুযায়ী কোন সামগ্রী ক্রয় করে এবং

তার নিকট এই শর্তে ভাড়া দেয় যে, গ্রাহক যদি কিস্তিতে সামগ্রীর মূল্য ও নির্ধারিত হারে ভাড়া নিয়মিত পরিশোধ করে তাহলে চুক্তি মুতাবিক নির্ধারিত সময় শেষে গ্রাহক সামগ্রীটির মালিক হয়ে যাবে। সম্পদের মূল্য সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক নির্ধারিত হারে ভাড়া পেতে থাকবে। চুক্তি সম্পাদন হওয়ার সাথে সাথে চুক্তিবদ্ধ সম্পদ গ্রাহকের নিকট হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু সম্পদটির মালিকানা থাকে ব্যাংকের হাতেই। এক্ষেত্রে গ্রাহকের ব্যবহার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়, মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। বিক্রিত সম্পদের পূর্ণ মূল্য ও নির্ধারিত ভাড়া পরিশোধের সাথে সাথে সম্পদের মালিকানা গ্রাহকের নিকট হস্তান্তরিত হয়। বিভিন্ন ধরনের যানবাহন ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো সাফল্যের সাথে পদ্ধতিটি ব্যবহার করে আসছে।

১৮. হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক (যৌথ মালিকানাভিত্তিক ভাড়ায় ক্রয়-বিক্রয় বা ইজারা বিল বায়ই তাহতা শিরকাতিল মিলক) : এ পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের আবেদন অনুযায়ী তার নিকট বিক্রী করার চুক্তিতে অংশীদারী ভিত্তিতে পুঁজির যোগান দিয়ে গাড়ি, যন্ত্রপাতি, বাড়ি ইত্যাদি ক্রয় করে থাকে। এরপর নির্ধারিত কিস্তিতে বিক্রীমূল্য পরিশোধের শর্তে গ্রাহক পণ্যটি ক্রয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। একই সাথে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের জন্যও অঙ্গীকার করে। এজন্যই একে তিন চুক্তির সমাহার বলা হয়ে থাকে। যৌথভাবে পুঁজির যোগান দেবার কারণে ব্যাংক ও গ্রাহক নির্ধারিত ভাড়া তাদের স্ব স্ব পুঁজির অংশ অনুপাতে ভাগ করে নেয়। সামগ্রীটির ব্যাংকের মালিকানাভুক্ত অংশের বিক্রয় মূল্য ও ভাড়ার অংশ কিস্তিতে পরিশোধিত হয়ে গেলে চুক্তির শর্তানুযায়ী নির্ধারিত সময়ের পর গ্রাহক সামগ্রীটির নিরংকুশ মালিকানা লাভ করে।

পদ্ধতিটির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

(ক) এই পদ্ধতিতে সম্পদের উপর ব্যাংকের মালিকানাধীন অংশ গ্রাহকের নিকট নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হারে ভাড়া দেওয়া হয়।

(খ) মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেও গ্রাহক ব্যাংকের অংশের পুরো টাকা পরিশোধ করে সম্পদটির পূর্ণ মালিকানা পেতে পারে।

(গ) ব্যাংক ও গ্রাহক স্ব স্ব পুঁজি অনুপাতে সম্পদের ঝুঁকি বহন করে।

(ঘ) চুক্তিপত্র সম্পাদনের সময়ে ব্যাংক গ্রাহকের কাছে সম্পদ বিক্রি করে না অথবা গ্রাহক ব্যাংকের কাছ থেকে সম্পদ ক্রয় করে না। এক্ষেত্রে ব্যাংক তার মালিকানাধীন অংশ পর্যায়ক্রমে/কিস্তিতে গ্রাহকের নিকট বিক্রি করার অঙ্গীকার করে এবং গ্রাহকও ঐ সম্পদ নির্দিষ্ট মূল্যে ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রয় করে নেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

(ঙ) চুক্তির শর্তানুসারে গ্রাহক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ব্যাংক সম্পদটি নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে এবং তা বিক্রি ও হস্তান্তরের মাধ্যমে ব্যাংকের বিনিয়োগ সমন্বয় করতে পারে।

(চ) ব্যাংকের লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে গ্রাহক সম্পদটির কোন সংস্কার, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, প্রকার রূপান্তর ইত্যাদি করতে পারে না।

(ছ) সম্পদটি অবশ্যই পচনশীল বা ব্যবহারের ফলে অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় এমন প্রকৃতির হবে না।

(জ) ভাড়া মেয়াদের শুরুতে সম্পদটি ব্যবহার উপযোগী অবস্থায় এর দখল ভাড়া গ্রহণকারীর কাছে অর্পণ করতে হবে।

(ঝ) সম্পদটি ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি ভাড়াসহ ক্রয় বিক্রয়ের অঙ্গীকার হতে স্বতন্ত্র। ভাড়া হচ্ছে সম্পদের সেবা বা সুবিধা ব্যবহারের মূল্য; তাই ভাড়ার পরিমাণকে দামের সাথে এক করা যাবে না।

(ঞ) ভাড়া গ্রহীতার কাছে সম্পদটি একটি ট্রাস্ট সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই তার অবহেলা, অব্যবস্থাপনা, দায়িত্বহীনতা ইত্যাদির জন্যে সম্পদটি ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হলে ভাড়া গ্রহীতা দায়ী হবে।

(ট) কোন পক্ষই একভাবে চুক্তি বাতিল করতে পারে না।

(ঠ) পরিশোধিত কিস্তি অনুসারে সম্পদের ভাড়াও আনুপাতিক হারে হ্রাস পায়।

ইজারা বিল বায়-ই তাহতা শিরকাতুল মিলক ও ইজারা বিল বায়-ইয়ের পার্থক্য

ইজরা বিল বায়-ই তাহতা শিরকাতুল মিলক	ইজারা বিল-বায়-ই
১. বিনিয়োগগ্রহীতা ব্যাংকের মূলধনের যে পরিমাণ টাকা পরিশোধ করেন, তিনি সম্পদের সে পরিমাণ মালিকানা লাভ করেন।	১. বিনিয়োগগ্রহীতা ব্যাংকের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পরই কেবল সম্পদের মালিক হন।
২. গ্রাহক কিস্তি পরিশোধ করার কারণে ব্যাংকের মালিকানা ক্রমান্বয়ে কমতে থাকায় মাসিক ভাড়ার পরিমাণও কমতে থাকে।	২. ব্যাংক সম্পদের মালিক বিধায় গ্রাহক যতদিন ব্যাংকের সমুদয় টাকা পরিশোধ না করবে ততদিন ব্যাংক একই হারে ভাড়া আদায় করবে।
৩. কিস্তি পরিশোধ করতে না পারলে সম্পদের ওপর ব্যাংকের মালিকানা বেশি থেকে যায়। ফলে ব্যাংক মালিকানা অনুপাতে ভাড়া আদায় করতে পারে।	৩. গ্রাহক কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে, সে ঐ পরিমাণ টাকা পরবর্তীতে পরিশোধ করতে পারে। তাতে ব্যাংক অতিরিক্ত কোনো ভাড়া দাবি করতে পারে না।
৪. কিস্তির টাকা মূল বিনিয়োগ হিসাবেই জমা করা হয়।	৪. কিস্তির টাকা আলাদাভাবে জমা করা হয়।

(ঘ) ঋণধর্মী পদ্ধতি

১৯. স্বাভাবিক মুনাফার হারে ঋণ : চায়ের দোকান, ফেরীওয়ালা, কামার, নাপিত, মুদীওয়ালা প্রভৃতি নানা ধরনের ছোট ছোট দোকানদার রয়েছে যাদের পুঁজির প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এরা সহজে সেই পুঁজি পায় না। উপরন্তু তারা ব্যবসার দৈনন্দিন হিসাবপত্র রাখে না বা রাখতে পারে না। এজন্য উপরে আলোচিত পদ্ধতিগুলোর কোনটির মাধ্যমেই এদের আর্থিক সহযোগিতা করা সম্ভব নয়। অথচ এদেরকে পুঁজি দিয়ে সহযোগিতা করতে পারলে এরা কর্মসংস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। এরা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ঋণ ফেরত দিয়ে থাকে। বরং বড় ঋণ গ্রহীতারাই ঋণ পরিশোধে দীর্ঘসূত্রীতা অবলম্বন

করে। তাই ইসলামী ব্যাংক নির্ধারিত স্বাভাবিক হারে মুনাফা প্রদানের শর্তে এসব ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ের অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে।

স্বাভাবিক মুনাফার হার নির্ধারণের পূর্বে ইসলামী ব্যাংকসমূহ এই ধরনের ব্যবসাসমূহের কমপক্ষে তিন বছরের লেনদেনের হিসাব নেবে, লাভ-লোকসানের হিসাব করবে এবং এর গড় হারের ভিত্তিতেই মুনাফার স্বাভাবিক হার নির্ধারিত হবে। সুদের হারের মতো এই হার স্থির বা সুনির্দিষ্ট নয়। অবশ্য বিনিয়োগের সময় চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে যে, যদি প্রকৃত লাভ নির্ধারিত স্বাভাবিক মুনাফার হারের চেয়ে বেশি হয় তাহলে ব্যবসায়ী স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত লাভের অংশবিশেষ ব্যাংককে প্রদান করবে। অপরপক্ষে যদি অর্জিত মুনাফা নির্ধারিত স্বাভাবিক হারের চেয়ে কম হয় কিংবা লোকসান হয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী তা সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করতে পারে তাহলে ব্যাংক মুনাফার ঐ নিম্নহার বা লোকসানই মেনে নেবে। সুতরাং, মুনাফার স্বাভাবিক হার আসলে একটি নিয়ন্ত্রণমূলক কৌশলমাত্র। সন্দেহ নেই, অর্থায়নের এই পদ্ধতি আকর্ষণীয় ও সহজ। কিন্তু এর সঠিক বাস্তবায়ন দুরূহ।

২০. করযে হাসানা : দানের চেয়ে করযে হাসানার সওয়াব বেশি। সওয়াবের নিয়তে এবং গ্রহীতার সাময়িক প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে তার অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে এবং কোন রকম প্রত্যুপকারের বিন্দুমাত্র আশা না করে করযে হাসানা প্রদানকারী অর্থ ঋণ দিয়ে থাকে। সুদনির্ভর ব্যাংকগুলো তো বটেই, বিত্তশালীরা পর্যন্ত এরকম ঋণ দিতে নারাজ। অথচ সচ্ছল ব্যক্তিরও অনেক সময় ঋণের প্রয়োজন পড়ে সাময়িক অভাব বা প্রয়োজন পূরণের জন্য। সে সময় যদি করযে হাসানার সুযোগ না থাকে তাহলে তাকে হয় সহায়-সম্বল বিক্রি করতে হবে অথবা নিরুপায় হয়েই সুদের ভিত্তিতে ঋণ নিতে হবে। ইসলামী ব্যাংক এই সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যেই করযে হাসানা দিয়ে থাকে। সুদভিত্তিক ব্যাংকে এই ধরনের সহযোগিতা পাওয়া কল্পনাতীত ব্যাপার। ইসলামী ব্যাংক তার গ্রাহকদের জরুরী ও স্বল্প মেয়াদী প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে ন্যূনতম হারে সার্ভিস চার্জের বিপরীতে ঋণ দিয়ে থাকে। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের প্রদত্ত করযে হাসানার ক্ষেত্রে এই হার ০.৫০% হতে সর্বোচ্চ ২.০% পর্যন্ত। পাকিস্তানে প্রচলিত এই হার প্রায় ৩.%। করযে হাসানা মঞ্জুরের সময়েই ঋণ গ্রহীতার সুবিধা অনুসারে ঋণ পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। শুধুমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রেই পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(ঙ) সেবামূলক পদ্ধতি

এ পর্যন্ত যে কুড়িটি পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে সেসব ছাড়াও ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে নানা সেবাধর্মী পদ্ধতি। এক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার নীতিই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সহযোগিতা তথা সেবাধর্মী এসব কর্মকাণ্ড তথা পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ক্যাশ ওয়াকফ হিসাব, মিউচুয়াল বীমা, উপদেষ্টা সেবা, মেইনটেন্যান্স সুবিধা, ব্যবস্থাপনা ও টেকনিক্যাল সমস্যা সমাধানের জন্য কনসালটেন্সি ও প্রশিক্ষণ প্রভৃতি। এসব সেবার মধ্য দিয়ে ব্যাংকের সুনাম ও আয় বৃদ্ধি দুই-ই হয়ে থাকে।

ইসলামী ব্যাংকের আয় বন্টন পদ্ধতি

খোদ ইসলামী ব্যাংকের আমানাতকারীদের (সাহিবুল মাল) অনেকের মনেই এই প্রশ্ন প্রায়শঃই উদিত হয় যে, ইসলামী ব্যাংক (অর্থাৎ মুদারিব) শত শত কোটি টাকা বার্ষিক মুনাফা অর্জন করলেও তাদের প্রাপ্ত মুনাফার পরিমাণ এত কম কেন? এর যথার্থ উত্তর পেতে হলে ইসলামী ব্যাংকের আয়বন্টন পদ্ধতি অর্থাৎ মুদারিব ও সাহিবুল মালের প্রাপ্য মুনাফার হিসাব কৌশল জানা জরুরী। এ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না থাকলে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ রয়ে যায়। তাই নীচে এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো ।

(১) মুদারাবা তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয় ব্যাংক ও আমানাতকারীদের মধ্যে চুক্তির শর্ত অনুসারে বণ্টিত হয়। বিনিয়োগ আয় বলতে ব্যাংকের নানা ধরনের সার্ভিস চার্জ, লকার ভাড়া, বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত কমিশন ইত্যাদি আয় বাদে বাকী আয়কে বোঝান হয়ে থাকে।

(২) ব্যাংকের বিনিয়োগযোগ্য তহবিল ব্যাংকের ইক্যুইটি পরিশোধিত মূলধন, সংবিধিবদ্ধ সঞ্চিতি, সাধারণ সঞ্চিতি ইত্যাদি, মুদারাবা আমানাত ও অন্যান্য জমা ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত। বিনিয়োগের বেলায় মুদারাবা আমানাত তহবিল অগ্রাধিকার পায়। অর্থাৎ, মুদারাবা আমানাত থেকে সর্বপ্রথম বিনিয়োগ করা হয় এবং মুদারাবা তহবিল সম্পূর্ণরূপে বিনিয়োগ করার পর ইক্যুইটি ও অন্যান্য জমা থেকে বিনিয়োগ করা যায়।

ক. বিনিয়োগ আয়ে মুদারাবা জমার অংশ নির্ধারণ

১. মুদারাবা জমাকারীগণ মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ আয়ের একটি পূর্ব নির্ধারিত অংশ (অর্থাৎ কমপক্ষে ৭০% ভাগ) পেয়ে থাকেন।

২. বাকি অংশ ৩০% পায় ব্যাংক। ব্যাংকের প্রাপ্ত ৩০% ভাগ আয় ব্যাংক সাধারণত নিচে বর্ণিত হারে বন্টন করে,

ক. বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা খরচ নির্বাহ	:	২০%
খ. বিনিয়োগ ক্ষতি সমতা সঞ্চিতি	:	১০%
মোট	:	৩০%

খ. মুদারাবা হিসাবসমূহে লাভ বন্টনে ওয়েটেজ পদ্ধতি

মুদারাবা হিসাবসমূহের লাভ বন্টনে 'ওয়েটেজ' পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। কেননা, মুদারাবা জমাকারীদের সব হিসাবের অর্থের গুরুত্ব ব্যাংকের কাছে এক রকম নয়। মুদারাবা হিসাবগুলো বিভিন্ন মেয়াদের হয়ে থাকে। আবার একেক জমাকারীর অর্থ ব্যাংক বিভিন্ন মেয়াদে বিনিয়োগ করে কোথাও কম, কোথাও বেশি ঝুঁকি নেয়। এ জন্য বিভিন্ন হিসাবের বিভিন্ন 'ভর' গুরুত্ব (Weightage) আছে। এই ওয়েটেজ আরোপ করেই মুদারাবা জমার ওপর ব্যাংক মুনাফার হার নির্ধারণ করে। যে নীতির ওপর ভিত্তি করে ওয়েটেজ আরোপ করা হয়, তা নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **জমার মেয়াদ :** জমার মেয়াদ যত বেশি জমাকারীর ঝুঁকি তত বেশি। বেশি মেয়াদের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে লাভের হার কমবেশি হওয়ার একটা ঝুঁকি থাকে। অর্থাৎ, হিসাব খোলার সময় লাভ বেশি থাকলেও ভবিষ্যতে তা কমে যেতে পারে। তাছাড়া মেয়াদি জমা মেয়াদের আগে উঠাতে চাইলে ঘোষিত লাভের হার কমে যায় বা আদৌ কোনো লাভ পাওয়া যায় না। এসব ঝুঁকির বিষয় বিবেচনায় রেখে সাধারণত বেশি মেয়াদে হিসাবে অপেক্ষাকৃত বেশি ওয়েটেজ দেয়া হয়।

২. **ব্যাংকিং সুবিধা :** কিছু কিছু হিসাবের বেলায় ব্যাংকিং সুবিধা কম অর্থাৎ টাকা লেনদেন বা অর্থ স্থানান্তর সীমিত। আবার কোনো কোনো হিসাবের বেলায়

ব্যাংকিং সুবিধা বেশি অর্থাৎ ইচ্ছামাফিক টাকা স্থানান্তর করা বা উঠানো যায়। যেখানে সুবিধা বেশি সেখানে ওয়েটেজ কম, মুনাফাও কম এবং যেখানে সুবিধা কম সেখানে ওয়েটেজ বেশি, মুনাফাও বেশি।

৩. **অন্যান্য ব্যাংকের হার :** ওয়েটেজ আরোপের বেলায় প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অন্যান্য ব্যাংকের প্রদত্ত হারও বিবেচনায় আনা হয় এবং এতে মুনাফার হার কম-বেশি হয়।

গ. মুনাফার হার নির্ধারণ ও বন্টন[২]

ইসলামী ব্যাংকের মুনাফা হিসাবের পদ্ধতি এবং শেয়ারহোল্ডার ও আমানতকারীদের মধ্যে তা বন্টনের প্রক্রিয়া একটা কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্যে নীচে তুলে ধরা হলো।

তহবিলের উৎস	মোট বার্ষিক আমানত (প্রোডাক্ট)	গুরুত্ব (ওয়েটেজ)	ওয়েটেড প্রোডাক্ট (২ x ৩)	মুনাফার আরোপিত হার (%)	মুনাফার বন্টন (২ x ৫)
১	২	৩	৪	৫	৬
১. পি এল এস মেয়াদী আমানত হিসাব					
৩ বছর	৩৫০০	১.০০	৩৫০০	১২.৪৩	৪৩৫.০০
২ বছর	৭০০	০.৯০	৬৩০	১১.২০	৭৮.৪০
১ বছর	৩২০০	০.৮০	২৫৬০	৯.৯৫	৩১৮.৪০
২.পি এল এস সঞ্চয়ী হিসাব	৯৮০০	.০৭০	৬৮৬০	৮.৭০	৮৫২.৬০
৩.পি এল এস স্বল্প মেয়াদী হিসাব	৪০০	০.৩৫	১৪০	৪.৩৫	১৭.৪০
মোট :	১৭৮০০	-	১৩৮৪০	-	১৭২০.৫৫
৪. পরিশোধিত মূলধন	৮০০	১.০০	৮০০	১২.৪৩	৯৯.৪৫
সর্বমোট	১৮৬০০	-	১৪৬৪০	-	১৮২০.০০

২. এই অংশটুকু মু. আ. হামিদ, *ইসলামী অর্থনীতি : একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ* (অনুঃ শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান), দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ২০০২, ২য় সংস্করণ হতে সংকলিত। পৃষ্ঠা : ১৫৭-১৫৯।

সারণীতে উল্লেখিত বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

(১) ইসলামী ব্যাংক দুই উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ করে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে : (i) পরিশোধিত মূলধন, এবং (ii) জনসাধারণের বিভিন্ন ধরনের আমানাত। এক্ষেত্রে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ টাঃ ৮০০/= কোটি এবং বিভিন্ন ধরনের আমানাতের পরিমাণ টাঃ ১৭,৮০০/= কোটি ব্যাংক সঞ্চয়ী আমানাত, স্বল্পমেয়াদী সঞ্চয়ী আমানাত এবং চার ধরনের মেয়াদী আমানাত রেখে থাকে। বিভিন্ন ধরনের আমানাতের পরিমাণ ২নং কলামে দেখানো হয়েছে।

(২) ধরে নেওয়া হয়েছে যে ব্যাংকের বিনিয়োগ আয়ের পরিমাণ সর্বমোট টাঃ ২,৬০০/= কোটি। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা প্রতি বছর একটা স্বীকৃত নীতি অনুসারে মুনাফা বন্টনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আমানাতকারীদেরকে দেয় মুনাফার পরিমাণ সাধারণতঃ ৬৫% এর মধ্যে ওঠানামা করে। এক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যমূলক (typical) নীতি নিম্নরূপ হতে পারে ঃ

৬৬.১৮% পাবে লাভ- লোকসানে অংশীদারীত্বের আমানাতকারীরা (টাঃ ৯৯.৪৫ কোটি)

৩.৮২% পাবে পরিশোধিত মূলধনের মালিকগণ (অর্থাৎ শেয়ার হোল্ডারবৃন্দ- টাঃ ৯৯.৪৫ কোটি)

৭০% (মোট টাঃ ১৮২০.০০ কোটি)

২০% হারে ব্যবস্থাপনা খরচ নির্বাহের জন্যে (টাঃ ৫২০.০০ কোটি)

১০% রিজার্ভ তহবিলে যাবে (টাঃ ২৬০.০০ কোটি)

১০০% (সের্বমোট টাঃ ২৬০০.০০ কোটি)

(৩) এখন প্রশ্নঃ টাঃ ১৭২০.৫৫ কিভাবে বিভিন্ন ধরনের আমানাতকারীদের মধ্যে ভাগ করা হবে? এই উদ্দেশ্যে ব্যাংক ওয়েটেজ (বা গুরুত্ব) পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। অর্থাৎ প্রতিটি শ্রেণীর একাউন্টের মেয়াদ বিবেচনা করে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সারণী-১ এর ৩নং কলামে এই গুরুত্ব দেখানো হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, তিন বছর মেয়াদী আমানাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব (১.০০) দেওয়া হয়েছে এবং লাভ-লোকসানের স্বল্পমেয়াদী আমানাতকে সবচেয়ে কম গুরুত্ব (০.৩৫) দেওয়া হয়েছে।

(৪) কলাম ৪ এ ওয়েটেড প্রোডাক্ট হিসাব করা হয়েছে (২ x ৩)

(৫) পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নঃ কিভাবে বিভিন্ন ধরনের আমানতের মুনাফার হার নির্ধারণ করা হয়? লক্ষ্যনীয় যে, টাঃ ১৩,৮৪০ এর (ওয়েটেড প্রোডাক্ট কলাম নং ৪ জন্যে টাঃ ১৭২০.৫৫ কোটি মুনাফা ঘোষিত হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, মুনাফার হার এক্ষেত্রে ১২.৪৩%। (অর্থাৎ, (১৭২০.৫৫ ÷ ১৩,৮৪০) x ১০০। এই হার স্বীকার করে নিলে অন্যান্য হারগুলো সহজেই ৩নং কলামে দেখানো 'ওয়েট' ব্যবহার করে হিসাব করা যায়। যথা : ১২.৪৩ x ০.৩৫ = ৪.৩৫। হিসাবকৃত হার দেখানো হয়েছে ৫নং কলামে।

(৬) প্রতিটি হিসাবে মুনাফার পরিমাণ কত? ২নং কলামে দেখানো মূল আমানাতকে ৫নং কলামের আরোপিত মুনাফার হার দিয়ে গুণ করলেই এটা পাওয়া যাবে। হিসাবকৃত মুনাফা সারণীটির ৬নং কলামে দেখানো হয়েছে।

উপসংহার

বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ও ব্যালান্সশীটসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উপরে উল্লেখিত কর্ম কৌশলসমূহ ব্যবহার করে তারা শুধু বিপুল মুনাফাই অর্জন করেনি, সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর তুলনায় আমানাতকারীদের বেশি হারে মুনাফা প্রদান করেছে। স্মরণ রাখা দরকার, সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর বয়স যেখানে দুইশ বছরের বেশি ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির বয়স সেখানে তিন দশকের কিছু বেশি। এখনও তার শৈশবকাল কাটিয়ে ওঠেনি ইসলামী ব্যাংক। আশার কথা, ইসলামী ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশনগুলো বিনিয়োগের জন্য শারীয়াহর দৃষ্টিতে বৈধ নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং সম্মিলিতভাবে একে অন্যের অভিজ্ঞতা হতে শেখার চেষ্টা করছে। ইসলামী ব্যাংকের সাফল্য একদিকে যেমন তার কর্মীবাহিনীর ঐকান্তিকতা, পেশাগত কর্মকুশলতা এবং দক্ষতার উপর নির্ভরশীল, তেমনি নির্ভরশীল তার অংশীদারী বিনিয়োগকারীদের সততা, যোগ্যতা এবং ব্যবসায়িক দূরদর্শিতার উপর। বিশেষতঃ আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রয়োজনীয় দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং একইসঙ্গে সততাসম্পন্ন ব্যবসায়ী পাওয়া খুবই দুরূহ। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহকে নিজ উদ্যোগে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

পরিশেষে এ কথা বলতেই হবে বর্তমান অনৈসলামী পরিবেশ, বিশেষতঃ প্রচলিত বাণিজ্যিক, রাজস্ব ও দেওয়ানী আইনের অনেকগুলোই ইসলামী ব্যাংকের সুষ্ঠু কার্য

পরিচালনার পথে বিষম বাধা। এসব আইনের পরিবর্তন বা সংশোধন প্রয়োজন। যেহেতু সংশ্লিষ্ট সরকারের অনুমতিক্রমে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনেই ইসলামী ব্যাংকগুলো পরিচালিত হচ্ছে, সেহেতু এসব আইন সংশোধন বা পরিবর্তনের দায়-দায়িত্ব তাদের উপরও বর্তায়। ইসলামী ব্যাংক এসব প্রতিকূলতার মধ্যেই কাজ করে যাচ্ছে এবং ক্রমাগত সাফল্যের সোপানে উত্তরণ লাভ করছে। বস্তুতঃ সুদী ব্যাংক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইসলামী ব্যাংক এক সাহসী ও ভিন্নধর্মী চ্যালেঞ্জ। সনাতন ব্যাকংগুলো যেখানে শুধুমাত্র আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ইসলামী ব্যাংকগুলো সেখানে একই সাথে আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের যোগফল। এই ব্যাংক শারীয়াহসম্মত উপায়ে মুসলিমদের রুটি-রুজীর ব্যবস্থার পাশাপাশি সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্যও পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইসলামী ব্যাংক তাই মুসলিমদের জন্য শুধু প্রয়োজনীয় এক প্রতিষ্ঠানই নয়, মুসলিম উম্মাহর জন্য অপরিহার্য এক ইন্সটিটিউশন।

পরিশিষ্ট

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রসার

ক. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা

সমগ্র বিশ্বে আজ ব্যতিক্রমধর্মী একটি ইসলামী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউশন সম্পর্কে জানবার ও বুঝবার জন্য বিপুল উৎসহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যেই ধনী-গরীব ও মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে নানা দেশে এই ইনস্টিটিউশনটি ক্রমাগত তার বিজয় পতাকা উড়িয়ে চলেছে। সুদনির্ভর অর্থনীতির দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় প্রচণ্ড এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে এই প্রতিষ্ঠান। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই জনগণ অবাক বিস্ময়ে (খানিকটা সংশয় জড়িতও) তাকিয়ে দেখছে বহুল আলোচিত প্রতিষ্ঠানটি তাদের একেবারে দোরগোড়ায় হাজির। প্রতিষ্ঠানটির নাম ইসলামী ব্যাংক।

অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান কায়েম করা এবং এক্ষেত্রে বিরাজমান হারাম পদ্ধতি থেকে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করাই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের দীর্ঘদিনের আকাংখা ইসলামী প্রক্রিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা সমস্যার সমাধান হবে। জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হবে। আজকের সমাজ যেসব অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যায় ভুগছে সেসব সমস্যার সমাধানে ইসলামী অর্থনীতির কৃতিত্ব ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আবারো প্রমাণিত হবে। বস্তুতঃ সমাজের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণ এবং সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতিই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য।

মিশরেই সর্বপ্রথম ১৯৬৩ সালে পুরোপুরি আল্লাহর নির্দেশ ও বিধি-বিধান অনুসারে পরিচালিত হবে এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এ বছরেই মিশরের মিটঘামার নামক স্থানে ইসলামী সেভিংস ব্যাংক নামে আধুনিক কালের সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যাংকটি বিপুল সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু ব্যাংকটি সে দেশের সুদনির্ভর ব্যাংকগুলোর চক্ষুশূল হওয়ায় ইসলামের দুশমন ও নিজেকে ফেরাউনের বংশধর

বলে দাবীদার প্রেসিডেন্ট জামাল আব্দুন্ নাসেরের সরকার এটি বন্ধ করে দেয়। সাফল্যই ছিল ব্যাংকটির বড় শত্রু।

প্রায় এক দশক পর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হিসাবে সে দেশে ১৯৭১ সালে নাসের সোশ্যাল ব্যাংক নামে আরেকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পরবর্তী বছর হতেই ব্যাংকটি সাফল্যের মুখ দেখে। এর পর ক্রমান্বয়ে ১৯৭৫ সালে সউদী আরবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক এবং ঐ একই বছরে সংযুক্ত আরব আমীরাতে দুবাই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৭ সালে সুদানে ফয়সাল ইসলামী ব্যাংক, কুয়েতে কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, মিশরে ফয়সল ইসলামী ব্যাংক এবং ১৯৭৮ সালে জর্দানে জর্দান ইসলামী ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর হতে প্রায় প্রতি বছর বিশ্বের কোন-না-কোন দেশে ইসলামী ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এই সংখ্যা প্রায় তিন শতে পৌঁছেছে।

উল্লেখ্য, সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলোর আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করতে সময় লেগেছে কয়েক শতাব্দী। কিন্তু আনন্দের বিষয়, পদ্ধতি হিসাবে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক রূপ লাভে সমর্থ হয়েছে। শুধু তেলসমৃদ্ধ আরব দেশগুলোতেই নয়, কৃষিপ্রধান ও দরিদ্র দেশেও ইসলামী ব্যাংক ও বিনিয়োগ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও হচ্ছে। তেলসমৃদ্ধ মুসলিম দেশসমূহে যে কয়টি ইসলামী ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে অন্যান্য দেশে। উদাহরণস্বরূপ সুদান, মিশর, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার নাম করা যেতে পারে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে ব্যবসা ও বিনিয়োগ কার্যক্রমের ইসলামী মডেল বিশ্বজনীনতা তথা ব্যাপক ও স্বীকৃত আন্তর্জাতিক রূপ লাভে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশের জনসমষ্টির প্রায় ৮৫% ইসলামের অনুসারী। ইসলামে সুদ নিষিদ্ধ একথা সকলেরই জানা। তাই সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর কখনও আত্মিক সংযোগ ঘটেনি। অথচ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে না পারলে জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন মহল থেকে তাই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার দাবী উঠেছে স্বাধীনতা লাভের পর হতেই। এ জন্য এযাবৎ গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিচে উল্লেখ করা গেল।

প্রথমেই সরকারের ভূমিকার কথা বলতে হয়। ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ও ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এসবের মধ্যে রয়েছে :

ক) আগস্ট, ১৯৭৪ সালে জেদ্দায় অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীদের সম্মেলনে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সনদে স্বাক্ষরকারী ২২টি সদস্য দেশের অন্যতম বাংলাদেশ। এই সনদ স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সরকার নীতিগতভাবেই দেশের অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং তৎপরতাকে ইসলামী শারীয়াহর আলোকে পুনর্গঠিত করতে সম্মত হয়েছে।

খ) ১৯৭৮ সালের এপ্রিলে সেনেগালের ডাকারে অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে। এই সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা গৃহীত হয় এবং পর্যায়ক্রমে মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়।

গ) ১৯৭৯ সালের নভেম্বরে সংযুক্ত আরব আমীরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এ দেশে দুবাই ইসলামী ব্যাংকের মতো ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চিঠি লেখেন। এরপর ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সালে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ বিভাগ এদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মতামত চেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে চিঠি দেয়।

ঘ) মে, ১৯৮০ সালে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে বাংলাদেশের তদানীন্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর মুহাম্মদ শামস-উল-হক সকল ইসলামী দেশে শাখাসহ একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক চালুর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করেন।

ঙ) এই প্রেক্ষিতে নভেম্বর, ১৯৮০ বাংলাদেশ ব্যাংক মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের ইসলামী ব্যাংকের কার্যপদ্ধতি পর্যালোচনা করার উদ্যোগ নেয় এবং সে আলোকে জানুয়ারী, ১৯৮১ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে সরকারের কাছে রিপোর্ট প্রদান করে।

চ) ১৯৮১ সালে ঐতিহাসিক মক্কা সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রস্তাব অনুসারে মুসলিম দেশসমূহে তাদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার আলোকে ব্যাংক ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের সুপারিশ

অনুমোদিত হয়। এজন্য বেসরকারী খাতে যৌথ উদ্যোগে ব্যাংক ও ফাইন্যান্সিং প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং এর মাধ্যমে ইসলামী দেশসমূহে বিনিয়োগকে ফলপ্রসূ করে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ছ) ১৯৮১ সালের মার্চে খার্তুমে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্য দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও মুদ্রা নিয়ন্ত্রণসংস্থা প্রধানদের সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি সর্বসম্মত কাঠামো উদ্ভাবনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জ) ১৯৮১ সালের ১৩ই এপ্রিল বাংলাদেশ ব্যাংকে অনুষ্ঠিত দেশের সকল রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের এক সভায় অবিলম্বে দেশের সকল জিলা সদরে সকল রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের একাধিক ইসলামী শাখা খোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বেসরকারী পর্যায়ে এদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গণসচেতনতা ও প্রাথমিক প্রস্তুতির কাজ শুরু হয় ১৯৭৯ সালের শুরু থেকে।

ক) এ বছরের জুলাই মাসে ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ ব্যুরোর (IERB) উদ্যোগে ইসলামী অর্থনীতির উপর তিনদিনব্যাপী এক সফল আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সেমিনারে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উপর পরবর্তী বছর এক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর আইইআরবি-এর উদ্যোগে দুদিনব্যাপী এই সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দেশী-বিদেশী গবেষক-অধ্যাপক ও চিন্তাবিদগণ অংশগ্রহণ করেন।

খ) বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বাস্তব কার্যপদ্ধতি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে নিয়মিত অনুশীলন ও সমীক্ষার জন্য ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ইসলামী ব্যাংকিং ইন বাংলাদেশ'। পরবর্তীকালে নভেম্বর, ১৯৮১-তে এটি বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকার্স এ্যাসোসিয়েশন (BIBA) নামে পুনর্গঠিত হয়। এর মূল শ্লোগান ছিল 'BIBA to fight against RIBA'। এর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সের উপর বেশ কয়েকটি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়।

গ) ঢাকার মুসলিম বিজিনেসমেনস্ সোসাইটির সদস্যগণও এদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখান। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর তারা এদেশে বেসরকারী খাতে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং এ উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত চেষ্টা চালানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন। একই সঙ্গে তারা ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ব্যাংক অব ঢাকা লিঃ নামে একটি কোম্পানীও গঠন করেন।

ঘ) ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম)-এর উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপর দুদিনব্যাপী এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঐ একই বছর এপ্রিল মাসে বায়তুশ শরফ ইসলামী গবেষণা ট্রাষ্টের উদ্যোগে চট্টগ্রামেও ইসলামী ব্যাংকের উপর এক সফল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি সেমিনারেই সর্বস্তরের জনগণ বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে অংশগ্রহণ করে।

ঙ) ১৯৮১ সালের ২৬ অকটোবর-২৪ নভেম্বর সোনালী ব্যাংক ষ্টাফ কলেজ ইসলামী ব্যাংকের উপর এক মাস মেয়াদী আন্তঃব্যাংক আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এই প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংক, সকল রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংক, বি.আই.বি.এম, প্রস্তাবিত ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ব্যাংক অব ঢাকা লিঃ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ হতে সর্বমোট ৩৭ জন অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ইসলামিক ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন বিভিন্ন মেয়াদের প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করেছে। বিআইবিএম-ও ১৯৮২ সালের ১৮-৩০ জানুয়ারী ইসলামী ব্যাংকিং এর উপর আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। এসব প্রশিক্ষণ কোর্সে দেশের সিনিয়র ব্যাংকারসহ বিভিন্ন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

চ) ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংক স্থাপনের জন্য সরকারের কাছে অনুমতি চেয়ে আবেদন পেশ করা হয়। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের একটি সমীক্ষা মিশন বাংলাদেশ সফর করে এবং এদেশে বেসরকারী খাতে ইসলামী ব্যাংক

প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা যাচাই করে। এই মিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রস্তাবিত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর পরিশোধিত মূলধনে অংশগ্রহণ করে অন্যতম উদ্যোক্তা শেয়ারহোল্ডার হিসাবে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শেষ পর্যন্ত সকল বাধা-বিপত্তি ও প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি লাভ করে বেসরকারী খাতে দেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংক-ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ। ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৩ সালের ৩০শে মার্চ।

খ. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রসার

দেশের দ্বিতীয় ইসলামী ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত হয় ২০ মে, ১৯৮৭ সালে। সউদী আরবের দাল্লাহ আল-বারাকা গ্রুপের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকটির নাম ছিল আল-বারাকা ব্যাংক লিঃ। পরবর্তীতে এর নাম পরিবর্তিত করে রাখা হয় দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক। সম্প্রতি ব্যাংকটির মালিকানা পরিবর্তিত হয়েছে। একই সঙ্গে নামও পরিবর্তিত হয়েছে। ব্যাংকটির নতুন নাম আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক।

দেশের ইসলামপ্রিয় জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য একটি বা দুটি ইসলামী ব্যাংক কোনক্রমেই যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে না। তাছাড়া ইতিমধ্যেই ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ ব্যুরোর সেমিনার-সিম্পোজিয়াম এবং ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ আয়োজিত দেশের বিভিন্ন জিলা ও বিভাগীয় শহরে সেমিনার ও ইফতার মাহফিলের আলোচনা ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতি জনমানসে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়। এই প্রেক্ষিতেই ১৮ জুন, ১৯৯৫ প্রতিষ্ঠিত হয় আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এবং ছয় মাসের কম সময়ের ব্যবধানে প্রতিষ্ঠিত হয় দেশের চতুর্থ ইসলামী ব্যাংক স্যোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (২২ নভেম্বর, ১৯৯৫)।

এছাড়া ফয়সল ইসলামী ব্যাংক অব বাহরাইনের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকায় ১১ আগস্ট, ১৯৯৭। বর্তমানে এদেশে এই ইসলামী ব্যাংকটির কার্যক্রম নেই। প্রাইম ব্যাংক ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ ঢাকাতে তার প্রথম ইসলামী ব্যাংকিং শাখা প্রতিষ্ঠা

করে। এর ঠিক দুবছর পরে (১৭.১২.৯৯) সিলেটে অনুরূপ আরেকটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উপরন্তু নতুন সহস্রাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক (১০ মে, ২০০১)। এছাড়া দুটি সুদী ব্যাংক পুরোপুরিভাবে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়েছে। এদের একটি এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক বা এক্সিম ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ (জুলাই, ২০০৪) ও দ্বিতীয়টি দি ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংক লিঃ (জানুয়ারী, ২০০৯)। এর বর্তমান নাম দি ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিঃ।

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং এদেশের কোটি কোটি তৌহিদী জনতার আস্থা অর্জনের উদ্দেশ্যে দেশের বেশ কয়েকটি সুদী ব্যাংক আলাদা ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খুলেছে। এদের মধ্যে রয়েছে :

১. ঢাকা ব্যাংক লিঃ
২. যমুনা ব্যাংক লিঃ
৩. দি সিটি ব্যাংক লিঃ
৪. সাউথইস্ট ব্যাংক লিঃ
৫. প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ
৬. আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিঃ

প্রধানতঃ ঢাকা মহানগরীতেই এসব শাখা কাজ করছে। দু-একটি ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা সম্প্রতি চট্টগ্রামেও খুলেছে।

এদেশে কর্মরত বিদেশী ব্যাংকগুলিরও কয়েকটি সীমিত পরিসরে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করেছে। এদের মধ্যে রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ও দি হংকং এন্ড সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন HSBC। শেষোক্ত ব্যাংকটি "সাদিক কার্ড" নামে সম্প্রতি একটি ইসলামী ক্রেডিট কার্ডও চালু করেছেন। অবশ্য এসব ব্যাংকের এই "ইসলামী সেবা" শুধুমাত্র রাজধানী ঢাকা কেন্দ্রিক। তবুও বলতেই হবে এসব কর্মকাণ্ডের ফলে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতির সাফল্য ও জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হচ্ছে। আশা করা যায়, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা ক্রমশঃ মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়াবে এবং উত্তরোত্তর সফলতা অর্জন করবে। ■

পাঠকসহায়ক বইপত্র

আশরাফী : ফজলুর রহমান, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং : কি, কেন, কিভাবে?* (ঢাকা : মাহিন পাবলিকেশান্স, ১৯৯৮)

ইসলাম : তাজুল এবং আবু তাহের মুহাঃ সালেহ, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা* (ঢাকা : ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৪)

উসমানী : মুহাম্মাদ তাকী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি : সমস্যা ও সমাধান*, অনু. মুহাম্মদ জাবের হোসাইন (ঢাকা : মাকতুবাতুল আশরাফ, ২০০৭)

আল-নাজ্জার : আবদুল আজীজ ও অন্যান্য *ইসলামী ব্যাংক কী ও কেন?* অনু. ও সম্পা. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহামন এবং মুহম্মদ শরীফ হুসাইন (ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২য় সংস্করণ ১৯৮৪)

মোহন : ইকবাল কবীর, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং* (ঢাকা : প্রিন্সিপাল পাবলিশার্স, ২০০৮)

রহমান : শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর, *ইসলামী ব্যাংকিং : পেছনে ফিরে দেখা* (ঢাকা : বিক্রম পাবলিকেশনস্, ২০০৪)।

রকীব : আবদুর ও শেখ মোহম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকীন : তত্ত্ব, প্রয়োগ, পদ্ধতি* (ঢাকা : আল আমীন প্রকাশন, ২০০৪।

শামসুদ্দোহা : মুহাম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা* (ঢাকা : ইন্টিগ্রেটেড এডুকেশন এ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ২০০৪)।

হক : এম. আযীযুল, *ইসলামী ব্যাংক : কতিপয় ভ্রান্তিমোচন*, অনু. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬)

হুসাইন : মুহাম্মদ শরীফ, *ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা* (ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, ১৯৯৬।

॥ সমাপ্ত ॥